পাখি ও সম্রাজ্ঞী

আফসানা কিশোয়ার

মানুষের আজন্ম স্বপ্নসাধ সম্ভবত 'ব্যক্তির, বয়স-দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে আচরণ একই। পরিণতির চিন্তা ছাড়াই মানুষ এ অনুপমবোধকে অনেক সময় চর্চা করে চলে। পরিণতি কি আসলেই সব সম্পর্কে মেলে? মুগ্ধতা, মায়া এমনতর আনুভবিক অনুসঙ্গকে কি অনেক ক্ষেত্রেই প্রেম বলে বিভ্রম হয়। আফসানা কিশোয়ারের বড় গল্প পাখি ও সম্রাজ্ঞীর প্রতি লাইনে মিলবে এসব প্রশ্নমালা।

অনেকেই ভুলে যেতে বলে, গন্ডগোলের বছর হিসেবে চিহ্নিত করে মুক্তিযুদ্ধকে নির্বিকার ঔদাসীন্যে। অথচ ঐ গন্ডগোল (!) হয়েছিল বলেই আজকের বাংলাদেশ। শহীদ ভাগীরথীকে নিয়ে সত্য ঘটনা অবলম্বন করে, অতীতকে বর্তমানের সাথে মিশিয়ে লেখক এখানে মুক্তিযুদ্ধে নারীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে যেমন টেনে আনেন বর্তমানের আলোতে তেমনি আমাদের সামনে ছুঁড়ে দেন সত্যকে স্বীকার করার এক দুঃসাহসী চ্যালেঞ্জ।

যুথবদ্ধতার ইতিহাস মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে। এর বিভিন্ন রূপ প্রেমে-বিবাহে-ভালোবাসায় প্রকাশিত। বিয়ের পরে নারীর জীবন একটু আলাদা। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এখনো স্বামীর চাইতে কৃতি স্ত্রীকে সহজ ভাবে নেওয়ার প্রবণতা তেমন গড়ে ওঠেনি। মানসিক দৈন্যতার জের ধরে চলে মনোনির্যাতন। *স্মৃতি হয়ে রবে* গল্পে ধ্বণিত তেমনি এক নারী অনুচ্চ কিন্তু মর্মে পৌঁছানো বাণী।

মা এক শব্দ, এক ভালোবাসা; মাতৃবন্দনা ভিন্ন আঙ্গিকে, অন্ধকারকে আলোতে ভাসানোর অঙ্গীকার- ত্রিকালে ডুবলো স্নেহের লোটা।

এক হিসেবে ব্যবসার নামে মিনহাজের মত হাজারো গার্মেন্টস শ্রমিক দিন বদলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে রাস্তায় নামছিল। কিছু আদায় হয়েছে। আর অনেক কিছুই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে আন্দোলনরত শ্রমিকদের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিদের বেঈমানিতে। মুনাফার লোভে যে নির্মম অত্যাচার আন্দোলনকারী পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের উপর চালায় এ দেশীয় বেনিয়া তার জার্নাল বাণিজ্যে, বসতের লক্ষ্মী।

এমন সব গল্প পড়তে গিয়ে পাঠকের মনে হতে পারে- আরে! এ তো আমারই গল্প! এখানেই গল্পকার হিসেবে আফসানার স্বার্থকতা। উপন্যাসের ছায়াতলে ছোটগল্প যেখানে হারাবার উপক্রম সেখানে আফসানার মত তরুণ লেখকদের হাতে সাহিত্যের এ শাখাটির পরিচর্যা নিঃসন্দেহে আমাদের আশাবাদী করে তোলে।

আফসানা কিশোয়ার জন্ম ঢাকাতে ১৯৭৮ সালের ৮ মার্চ। ২০০০ সালে লেখালেখি শুরু *যায়যায়দিন* এর মাধ্যমে। তারপর *প্রথম আলোর* সেরা ফিচার লেখকের স্বীকৃতি। এরপর আর পেছন ফেরা নয়। প্রথম শ্রেণীর বেশ ক'টি দৈনিকের নিয়মিত লেখক হয়ে ওঠেন। দেশের ভেতর, বাহির থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন ম্যাগাজিনে তার লেখা ছাপা হচ্ছে। ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের প্রথম কাব্যোপন্যাস *রোজনামচা : ভালোবাসা*, অপূর্ব নির্মাণশৈলী ও শব্দচয়ন এই কাব্যোপন্যাসকে দান করে ভিন্নমাত্রা। পদ্য, লেখকের অন্যতম প্রিয় বিষয় হলেও গদ্যে তিনি সমান স্বাবলীল। *নস্টালজিয়া* ও *ত্রৈরাশিক* এই দুই গল্পগ্রন্থে তিনি তার সেই পারদর্শীতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ২০০৫ ছিল লেখকের জন্যে স্মরণীয় বছর । এ বছর শব্দোৎসব ৬০টি কবিতার একটি দীর্ঘ স্যিকুয়েল, নান্দনিক অলংকরণসহ প্রকাশিত হয় এবং সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়। ২০০৫ এ বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের উপর লেখা লেখকের *প্রবাসের খেরো কবিতার* প্রকাশ ও ভিডিওচিত্র নির্মাণ করে মালয়েশিয়ার অভিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করছে এমন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা *টেনাগানিটা*। বর্তমানে একটি বেসরকারী ব্যাংকে কর্মরত। *পাখি ও সম্রাজ্ঞী* তার তৃতীয় গল্পগ্রন্থ।

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ :

রোজনামচা : ভালোবাসা (কাব্যোপন্যাস, মে ২০০৪)
নিষিদ্ধ ইশতেহার (অনুকাব্য, একুশে বইমেলা-২০০৫)
নস্টালজিয়া (ছোটগল্পের অনুগ্রন্থ, একুশে বইমেলা ২০০৫)
শব্দোৎসব (কবিতা, একুশে বইমেলা ২০০৫)
ত্রৈরাশিক (বড়গল্প, একুশে বইমেলা ২০০৫)
পাল্টায় নারী, বাহারি (কবিতা, একুশে বইমেলা ২০০৭)

পাখি ও সম্রাজ্ঞী

আফসানা কিশোয়ার

উৎসর্গ–
শহীদ ভাগীরথী
শহীদ সেলিনা পারভীন
এবং
বাংলাদেশের সেইসব নারীকে যাঁদের কারণে
আমি স্বাধীন দেশে ,বাংলা ভাষায় লিখতে পারছি

সূচি

পাখি ও সম্রাজ্ঞী / ৯
আংটি / ৩৮
কাল ও ভূপাল / ৪১
প্রাপ্তি / ৪৫
স্মৃতি হয়ে রবে /৪৮
ত্রিকালে ডুবলো স্নেহের লোটা / ৫৪
বিষণ্ন বেহুলা / ৫৭
এক চিমটি, অফিস /৬৫
বাণিজ্যে, বসতে লক্ষ্মী /৭১

পাখি ও সম্রাজ্ঞী

চলার শুরু :

২০০৫-এর ফেব্রুয়ারি মাসে এই ঢাকা শহরের বন্দি নাগরিকগণ একেবারে হঠাৎ করেই পেয়ে যায় এক বহুল কাঙ্ক্ষিত ছুটির অনুমতি। ১৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার, ১৮ শুক্র, ২০ তারিখ মহররমের বন্ধ, আর ২১ তো মাতৃভাষা দিবস। মাঝখানে ১৯ তারিখটা ছুটি নিতে পারলেই মুক্ত শ্বাস, ছুট-ছুট ঢাকার বাইরে। এদিকে বুকের খানাখন্দে গোপনে রাখা সম্পর্কিত মানুষদের পাঁচদিন ফোনের, দেখার বাইরে রাখবে বলে অনেকে মনে মনে একটু আক্রান্তও হয়। তুলনামূলকভাবে অল্পবয়সী যে চরিত্র 'পাখি', সে বেছে নেয় তার 'সম্রাজ্ঞী'কে পহেলা ফাল্গুনের আগের রাত পর্যন্ত ধারাবাহিক এক চিঠি লেখার পথকে। সম্রাজ্ঞী, পাখি যখন ঢাকা শহর ছাড়ে তখন, তাকে ভাবে আর লিখে চলে সেসব চিঠিগুলোর উত্তর অথবা কাউন্টার পার্ট। আর এভাবেই রচিত হয়ে যায় পাখি ও সম্রাজ্ঞীর পত্রালাপের এক অনবদ্য কাহিনী।

কূজন

- **তুমি ছাড়া এ শহর, এক্কেবারে কবর, ক-ব-র...**

০১.০২.২০০৫
মঙ্গল

দেখা না হলেও এ শহরটাতে আছেন—এ ভাবনাই অশান্ত মনে কিঞ্চিৎ স্বস্তি দেয়। পাঁচদিন থাকবেন না, ইন্ডিয়া যাবেন—কী করবো তখন? জানি, মানুষ সব পারে। কিন্তু এমন পারা কেন পারতে হবে! ইন্টারন্যাশনাল রোমিং আছে মোবাইলে? সাহস থাকলে বলেই ফেলতাম—'আমাকেও সাথে নিও, নেবে তো আমায়...।' পারবো না। যুক্তিবাদী মন অন্যায় আবদার জানে না, র‍্যাশনাল হবার এ এক অনেক বড় জ্বালা।

আমরা বড় বেশি নাম খুঁজি যে কোনো সম্পর্কের। একটা প্রচলিত নাম না পেলে আমরা বড্ড বেশি রকমের অস্বস্তিতে ভুগি। আমি শুধু জানি—

সম্পর্ক কখনো কোনো লেনদেন নয়, ওঠাবসা নয়,
সম্পর্ক নিশ্চয় আরো কোনো গভীর নিয়ম,
আরো স্বতঃস্ফূর্ত, আরো স্বাভাবিক
জন্ম নেয় হঠাৎ কখনো কারো বুকে
নিজেও জানে না,
সম্পর্ক আসলে এক অন্তরের
ফুটে ওঠা ফুল।
(সম্পর্ক : মহাদেব সাহা)

- **সময় যখন পেছন ফেরার**

০২.০২.২০০৫
বুধ

বারো বছর বয়স থেকে লিখে যাচ্ছি ডায়েরি। এখনো লিখি। এ বছর আমি সাতাশ হবো। কতো কী থাকে! অনেক বছর পর পড়ে হাসি। ২০০৩-এর সেপ্টেম্বরের শেষ, সম্রাজ্ঞীর পরনে মণিপুরী কাপড়ের একটা ড্রেস। মনে হয়েছিল ড্রেসটা যিনি পরেছেন তাঁর কারণে প্রাণ পেয়েছে। আমার অফিসের নারী কলিগরা সবাই তা নিয়ে কথা বলছে, সম্রাজ্ঞী উত্তর দিচ্ছেন। সারাদিন শুধু ভাবলাম মনের ভাব মানুষ কতো সুন্দরভাবে প্রকাশ করে। সেদিন জানলাম সব শিল্পের গুরু—নান্দনিক ভঙ্গিতে—বাচনে অন্যের কাছে নিজেকে পৌঁছানো। সেই থেকে শুধু দেখছি। ভালোলাগা, আক্ষেপ, চাপান-উতরোন সব পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত বুম্, বলে ফেললাম আমি আপনাকে ঠিক কতোটা গভীরে চাই। আপনি সহজ সম্ভবে আছেন বেশ। আমিও আমার প্রাপ্তবয়স্কতার দোহাই দিয়ে ডেমকেয়ার ভাবে মনে মনে গাইতে চাইছি—'বেদনা মধুর হয়ে যায়'...জগজিৎ সিংয়ের মতো। অথচ আমার সত্য বোধ যেন বারেবার ধরা পড়ে মুন্নীর গজলে—

মেঁ খায়াল হুঁ কিসি অর কা
মুঝে সোচতা কোই অর হ্যায়
সারে আয়না মেরে আক্স হ্যায়
বাস্ আয়না কোই অর হ্যায়
মেঁ কারিব হুঁ কিসি অরকে
মুঝে জান্তা কোই অর হ্যায়।

কে জানে, হয়তো আমার ভাবনাই জটিল, ভালোবাসা আদপে সরল। তাই যেন হয়—এই প্রার্থনা পরম ব্রহ্মের/আল্লাহ্‌র/ভগবানের কাছে।

▪ সম্রাজ্ঞী পার্টিতে, আমি ফোনের পাশে কুকুর যেভাবে হাড় পাহারা দেয় তেমন মনোযোগে

০৪.০২.২০০৫
শুক্র

প্রাত্যহিকতা বড় ভয়ংকর, তার সময়মতো জল চাই, চাই রুটিনমাফিক আহার। তাই বন্ধনহীন গ্রন্থির ভালোবাসা এখনো মানুষকে আন্দোলিত করে যারপরনাই। অনেক আগে আমি যখন পাবলিক লাইব্রেরিতে থাকতে থাকতে শুধু আর দারোয়ানের চাকরিটা নেয়া বাকি ছিল, তখন লাইব্রেরির সিঁড়িতে বসে একটা গান শুনেছিলাম—বন্ধুরা চায় বিকেলে আড্ডা, প্রেয়সীর চাই মানিব্যাগ। দৈনন্দিন অভিধাগুলো এমনই। সেখানে 'শত মানুষের ভিড়ে তোমাকে পাওয়া' সত্যিই দুস্কর। চোখ বন্ধ করা, ভাবা, এমন শান্ত অবকাশ কোথায়?—'কোথায় শান্তি পাবো, কোথায় গিয়ে'...মৌসুমী ভৌমিকের এ উচ্চারণ আসলেই বড্ড বেশি সত্য আমাদের নাগরিক কোলাহলে।

আপনি আমাকে অশেষ ধৈর্য্যের সাথে বোঝাবার প্রয়াস পাচ্ছেন বিয়েটা কোনো ছেলেখেলা নয়। বিয়ের আগের জীবন আর পরের জীবন পুরোই ভিন্ন। তাই আমি যেন আবার ভাবি, কোনো ভুল না করে ফেলি! বন্ধুদের বছরের পর বছরের ধুন্ধুমার প্রেম দেখেছি। প্রিয়ার গালের টোলে 'সিরাজী' রেখে পান করবে, এমন স্বপ্নও দেখতে দেখেছি কাউকে কাউকে প্রেমের প্রাথমিক উত্তেজনায়। এ যুগে হয়তো 'সিরাজী' পাওয়া যাবে না; ট্যাকুইলা-ভদ্‌কা পানের ইচ্ছে জাগে কারো কারো মনে। এসব স্বাপ্নিক মানুষের প্রগাঢ় বোধের লেনদেনেই আবার দেখেছি শূন্যতা কিভাবে ডানা মেলে। দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিছুদিন পরে নিজেই বিস্ময়ের উত্তর খুঁজে পেয়েছি। আমাদের জীবনের অর্ধেক কাটে অভিনয়ে, অভিনয়টা যখন আর ধরে রাখা যায় না তখনই আতান্তর/মতান্তর ঘটে যায় অকস্মাৎ। আমরা একজনকে ভালোবেসে আরেক জনের ঘরও করে ফেলি অনায়াসে। শুধু গোপনে নিজেকে কষ্টের দেহাতি সুরে বলে উঠি 'আহ্! কী অসহ্য'। নিজেকে নিজে শোনাই বিধ্বস্ত হাসিতে—

তুঁ কারিব আ, তুঝে দেখ লুঁ
মেরি পাস কোই অর হ্যায়

সময়ের গর্ভে অনেক বেদনার সাথে নাকি জড়িয়ে থাকে অমিত সম্ভাবনাও। আশাবাদী মানুষ অনুকূল 'সম্ভব'টুকুই নেবার ইচ্ছে রাখে। আমারও তাই। বন্ধুদের কোলাহল, দায় রক্ষার সামাজিক আচার ছুঁড়ে ফেলে নির্জনতার বৈভবে সুখ-সম্ভব-কল্পনায় ভাসার ইচ্ছে জাগে।

কোনো কোনো রাত খুব বড় মনে হয়, বিশেষ করে যখন অপেক্ষা করি কোনো মধুর শব্দের—যেমন ফোন। ভাবতে চাই একা মন একা ঘরে আঁধারের অভিসারে, একা একা কথা কইবার দিন শেষ। আমার আঁধার, মুখ মুছে নেবে সম্রাজ্ঞীর দেয়া আলোর রুমালে।

▪ দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে...

০৪.০২.২০০৫
শুক্র, রাত ১:৩০
ফোন রাখার পর

ভাবতে না ভাবতেই আপনি ফোন করলেন। মনের ঝুল-বারান্দায় টপাটপ ঝাড়বাতি জ্বলে উঠলো স্বাধীনভাবেই। প্রথমবারের মতো আপনার কর্মজীবন নিয়ে টুকরো কিছু কথা বললেন। প্রথম ব্যবসায় বাবার এক লাখ টাকা গচ্চা দেয়া মেয়ে ত্রিশ ছুঁতে ছুঁতে এক সময় বাণিজ্যটা ভালোই বুঝে ফেললো। সেই সাথে মনের ঘরে লালিত বহু দিনের ইচ্ছে সমাজসেবা, মানুষের জন্য একটু কাজ করার আগ্রহটাও পাখা মেলতে শুরু করলো। তারপর সব পরাজয়, লোকসান পেছনে ফেলে একদিন বর্ষসেরা 'নারী উদ্যোক্তা'—এমন মুকুটও পরে ফেললো। তিন লাইনে গল্প শেষ। আসলে কি তাই? না। প্রায় ঘণ্টা-ছোঁয়া আলাপের পর আমি লেখার জন্য এই-ই খুঁজে পেলাম! কিছুই যে জানা হলো না, প্রতিবার ফোন রাখলে এমনই মনে হয়।

আপনার ভাষ্যমতে বন্ধুত্ব প্রেম ছুঁলেই সম্পর্কটাতে অবধারিত ক্ষয় নেমে আসে। 'পেয়ার দোস্তি ভি হ্যায়'—আপনার শাহরুখের ডায়ালগ 'কুচ কুচ হোতা হ্যায়'-তে, অন্যভাবে লিখলাম। যে বন্ধু হতে পারেনি, সে Soul Mate কিভাবে হবে? অনধিকার চর্চা করলাম কি? যদি করে থাকি তবে কানে ধরে ওঠ্-বস করি মনে মনে।

স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখি অগণন। স্বপ্নের সাথেই আমার বসতবাটি। ভূমিষ্ঠ হোক বা না হোক, তার জন্মস্থান মন, সেখানে 'স্বপ্ন' স্বতন্ত্র একজন, সম্রাজ্ঞীর চেয়ারের/সিংহাসনের পাশে হাতল ধরে আমৃত্যু দণ্ডায়মান; স্বপ্ন এমনই—কথা দিতে চায়... দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে, নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে...

■ **আলোয় ভুবন ভরা, মুখোমুখি বসে খেলাম কী যে ধরা!**

০৫.০২.২০০৫
শনি

এ কি সত্য, সকলই সত্য... এমনও আমি ঘটাতে পারি! অবিশ্বাস্য ঠেকছে, কিছুতেই ব্যাপারটা আত্মস্থ করে উঠতে পারছি না। আপনার সামনে, আপনার বাসায় আমি পঁয়তাল্লিশ মিনিট! কিমাশ্চর্যম, স্বাভাবিক ছিলাম?—মনে হয় না। এখনো কাঁপছি, লেখা আঁকাবাঁকা না হবার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছি। অবস্থাটা কেমন বলি—

আমি লিখে চলি :
আমি তোমাকে বলি :
আমি আমাকে বলি,
জল, আগুন, বাতাস এবং মাটির শব্দ দিয়ে
আমার দৃষ্টিপাতের বাগান আবিষ্কার করি।
(মূল : স্প্যানিশ, কবি অক্টাভিও পাজ,
অনুবাদ : হায়দার আলী খান)

কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। সামনে আপনার দেয়া লেখা, যেটা এডিটিংয়ের জন্য নিয়ে এসেছি। আমার সবটা জুড়ে কবিতার হলাহল, নিজের নয়, অন্যদের লেখা; কাছে থাকলে অথবা ফোন পেলে শোনানো যেতো—

ভালোবাসা এবং কল্পনা
যমজের মতোই আপন
যা ঘটেছে তাকে জপ নয়
যা ঘটে নি তাতেই যাপন।
(পূর্ণেন্দু পত্রী, কথোপকথন তিন, কবিতা-৫)

চোখ জুড়ে ঘুমের মাকড়শা জাল বুনছে, তথাপি আমি...ঈশ্বর জানেন কী ঘটছে। সব শূন্য করে বসে আছি। যেন বা কোনোদিন জন্মিনি এই ইট-কাঠ-পাথরের শহরে। ভেঙে পড়ছে বোধের আচার—'তোমার থেকে ফিরে আর মেলাতে পারি না ঘর-সংসার।' আপনি প্লিজ ভ্রু কুঁচকাবেন না। আমি জানি, সময়ে আবার আমি সংযত হবো, সব উপুড় করে দেবো কলম সমেত কাগজেরই বক্ষপুটে। কিন্তু মাঝের এই সময়টুকু যখন—

ক্রমে একা হতে হতে জীবনীশক্তির অপচয়ে
রক্তে রক্তে অসুস্থতা কাঁটাতারে ঘিরেছে যখন,
তখনই এসেছো ফিরে। এখন বিশ্বাস করতে পারি
আমার নিজস্ব বিশ্ব পুনরায় রাঙা হয়ে যাবে
সেজানের আপেলের সবুজের আলোর দ্যুতিতে।
(পূর্ণেন্দু পত্রী, কথোপকথন চার, কবিতা-২)

জোর করে হলেও এবার আমার কলম থামানো উচিত। কলম থামলেও ঘুম হবে না। কারণ—

কোনো কোনো রাত খুব দীর্ঘ মনে হয়—
দেবদারু বনে অরণ্য-শালিক, কাষ্ঠও
ঘুমায়, ঘুমায় পাতারা, দূরে, কিছু
দূরে ঘুমায় নদী ও মাঠ
বনোভূমি; শিশিরের শব্দে মনে হয়
একা একা শুধু এই রাত্রি বুঝি জাগে।
আমি জাগি এই দীর্ঘ রাতে, ঘুমায়
মানুষ আর বৃক্ষ, মেঘদল।
(কোনো কোনো রাত: মহাদেব সাহা)

সুখের এ রাত শেষ না হোক, আমি ভালোলাগায় ছোট ছোট মৃত্যুর মুখোমুখি হই বার বার। কে জানে কী হবে, তবে এ দিনটা আমার মৃত্যুক্ষণেও মনে রবে, এমনটা ভাবতে ভালো লাগছে।

■ **লেখায় অনিয়ন্ত্রিত ছুরি চালিয়ে, মনোবেদনা**

০৬.০২.২০০৫
রবি

দিনে দিনে মামুলি থেকে মামুলিতর হয়ে যাচ্ছি খুব, টের পাই। নিজেকে কেমন যেন পর্যুদস্ত লাগে, লাগে ভয়ানক ভণ্ড। আপনার এসএমএস পেলাম রাত একটায়। মেসেজের শেষ লাইন এমন—'ভালো থেকো যেমনভাবে ভালো থাকতে চাও।' ভালো থাকার সংজ্ঞা কী? মানুষ যখন নিজেরই চঞ্চুর আঘাতে বার বার ক্ষত-বিক্ষত হয়, তখন সে কোন মন্ত্রে ভালো থাকবে? আমার কেন যেন মনে হয়, আপনি আমার প্রতিটি আচরণ খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছেন। তারপর নেবেন আমার চূড়ান্ত পরীক্ষা, আমাকে শুধু প্রাথমিক আবেগের ঝড় সামলানোর সময় দিচ্ছেন। জানি না আগামী দিন কী হবে, আমি বাঁচি কবিতায়—

এই শহরেই আছে একজন যার ধ্যানে কাটে
সারাবেলা, যার নাম উচ্চারণে ক্লান্তি নেই আর
যার কথাশিল্প থেকে পাই কতো কবিতার শাঁস,
যার পদধ্বনি বাজে আমার সনেটে বার বার,
যাকে খুঁজে পেতে চায় কৌতূহলী জন এই বাটে,

তার উদ্দেশ্যেই ন্যস্ত আমার এ নিঃশ্বাস, বিশ্বাস।
(তার উদ্দেশ্যেই ন্যস্ত, শামসুর রাহমান)

বি.দ্রঃ আপনার দেয়া লিখাটা বলেছিলেন একটু মোডিফাই করতে, আমি পুরোটাই বদলে এখন ভুগছি অসম্ভব মনোকষ্টে।

■ **সরিয়ে মনোবেদনা, বাজে স্বস্তির তারানা**

০৭.০২.২০০৫
সোম

দূরে থাকা মেঘকে বার বার বলেছি দূরে দূরে থাক্, ফাগুনের হাওয়া এলে সামলে রাখ্, সে আমার কথা শোনেনি; সকাল-বিকেল আমার আকাশে তার ছুটোছুটি। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি মানুষের বলা ফাল্গুন অথবা পলাশের মাস, আমার জন্য নিয়ে আসছে সমূহ সর্বনাশ। পা কেটে, যে কাঁচে কেটেছে পা তাকেই সযতনে বুক-পকেটে রাখছি, রক্তাক্ত হচ্ছি, এ কি চূড়ান্ত বোকামি! মাঝে মাঝে নির্বুদ্ধিতা দারুণ কাঙ্ক্ষিত থাকে, যতোই দিতে হোক না কেন আক্কেল সেলামি।

যদি পারতাম তবে বলতাম, 'আমি তোমার সকল বেদনা ওষ্ঠ-করপুটে তুলে নেই সযতনে'—পারবো না। তাই আপনার ঘাড়-ব্যথা আপনারই থাকে। আমি শুধু প্রার্থনা করতে পারি—'তোমার তরে আমার প্রার্থনা, আমার আর্তনাদ...'—নতুন ব্যান্ড 'ব্ল্যাক'-এর গান, তাহসান মেইন ভোকাল, তবে সাইড ব্যাকগ্রাউন্ডে এলিটা নামের যে মেয়েটা গলা দেয়, তার স্বরই বেশি আকর্ষণীয় লাগে আমার কাছে। ভালোই গায় এরা, শুনে দেখতে পারেন। তবে কনসার্টে ওদের পারফরমেন্স খুবই বাজে।

আপনাকে যে আমি কোনো সম্বোধন করি না, তা কি আপনি লক্ষ করেছেন? অনেক চেষ্টা করি, পেরে উঠি না। মনের গর্ভগৃহে আশার প্রদীপ জ্বলে-নেভে, সেগুলো প্রকাশ করতে আমি অবিরাম আপনাকে অন্যের লেখা কবিতা লিখে চলেছি। এবার আমার একটা সহজিয়া কবিতা হোক—

দু ফোঁটা জল ফেলো তাও আমি চাইনি,
করুণায় আর্দ্র হয়ে টেনে নাও আমার শালপ্রাংশু বাহু—
এমন কাঙ্ক্ষা ছিল না কস্মিনকালেও।
আমি শুধু তোমার ঠাস-বুনোট ব্যক্তিত্বে
আমার অগোছালো স্বভাবকে গচ্ছিত রেখে
আত্মবিশ্বাসে মগ্ন হতে চেয়েছি বিনা দ্বিধায়।
আমার চাওয়া-না পাওয়ায় তোমার
কিস্‌সু যায় আসে না এ ভালোই জানা;
তথাপি তোমার আকাশে মেলে চলি ধীরে
স্বপ্নাক্রান্ত পাখির ইচ্ছুক, অর্বাচীন ডানা।

আমরা যে ভাষা ব্যবহারে এখনো কতোটা পিছিয়ে তা ওপার বাংলার কবিতা, উপন্যাস যে কোনো কিছু পড়লে টের পাই। অন্যে শুনলে হা হা করে উঠবে, ভারতীয় দালাল ইত্যাকার শব্দে ভারী হয়ে উঠবে বাতাস। আপনাকে অমিতাভ দাশগুপ্তের 'তিন টুকরো' কবিতার প্রথম টুকরো বলি—

যদি ডাকো, সে-রকম ডাকো
সাড়ে তিনশো মাইল ডিঙিয়ে
বল্লমের মতো ঠিক তোমার হৃৎপিণ্ডে বিঁধে যাবো।

পড়লেই কেমন গা ছমছম করে না! মনে হয় না আসলেই সব পেরিয়ে ছুটে যাই কাঙ্ক্ষিত সত্তার কাছে! দ্বিতীয় টুকরো পড়লে আপনার মনে হবে, প্রথম টুকরোতে বলা সেই 'ডাক' আসেনি। তাই আবার হাহাকার—

এখন দিন স্বপ্নহীন
রাত্রি যায় অনিদ্রায়,
মেঘ পালায়, আলো পালায়,
ধনুকে টান রাখি ছিলায়
কিভাবে আর? এক পাহাড়
জমছে শুধু অন্ধকার,
এখন দিন স্বপ্নহীন
রাত্রি যায় অনিদ্রায়।

আমাকে আজকে ভূতের মতো কবিতায় পেয়েছে। শুনবেন জিপসি রায়ের একটা কবিতার অংশবিশেষ? আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করেই বলছি—

এখন মরেও যেতে পারি
শরীর আনন্দে ছমছম
আমার অল্প ছিল খেলা
কান্না এসেছে, সঙ্গম।

চারটা লাইন, কতো কী বলা হয়ে গেলো, এমন লাগে না!

উত্তর পাবো কী পাবো না, ভাবি না। লিখার আনন্দে লিখি। প্রতি অক্ষরে অনুভব করি সেই বোধ—স্বপ্ন নয়, শান্তি নয়, ভালোবাসা নয়, বুকের মাঝে এক বোধ জন্ম

লয়—সেই বোধে বেঁচে থাকা সুন্দর এবং আমি তাকে চাই না এড়াতে। সে এসে হাত রাখুক আমার হাতে...মনে হয় ছন্দ মেলালাম, হাহ্, হাহ্।

রাত হোক বেদনাবিহীন, ঘুম থাকুক চুলবুলের চোখ জুড়ে।

■ **ছায়াকুড়ানি নেয়ে, আপ্লুত ছায়ার সত্তাধিকারীকে পেয়ে**

০৮.০২.২০০৫
মঙ্গল

এক একটা দিন আসে, মন-বারান্দায় জুঁই ফুলের ছড়াছড়ি। থেকে থেকে হাসি। কাউকে বলা যায় না সুখের নদীর উৎস, জানানো যায় না পেয়ে গেছি পারাপারের শেষ পারানি। আপনি চোখের সামনে, আপনারই বই হাতে। আমার অগোছালো, কনজাস্টেড অফিসটা সমুদ্র হয়ে যায়, বুকে অগুনতি ঢেউ। আমি কাঙালিয়া, উড়ু-উড়ু ভগ্ন বাউল; কতোদিন কতো বছর গান গাই না। সেই অভ্যাস থাকলে অবশ্যই গাইতাম—

'মানুষ আমি, আমার কেন পাখির মতো মন
তাইরে নাইরে নাইরে গেলো সারাটা জীবন'
(কথা, সুর এবং শিল্পী : পথিক নবী)

যদি সত্যিই এভাবে যেতো সারাটা জীবন! এই কিছুদিন আগেও আমার ভাব ছিল এমন—

সারাদিন পর যখন ঘরে ফিরে আসি
তখন মনে হয় একটি দিনের জন্য সত্যিই বেঁচে গেলাম আজ
আর সারারাত পাড়ি দিয়ে যখন ভোর হয়
তখন, মনে হয় একটি রাতের আয়ুর জন্য
হে প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ দেই—
এই তো আজ বেঁচে থাকার আনন্দ!
(এই তো আজ বেঁচে থাকার আনন্দ : মাহবুব বারী)

এখন আমি নিশ্চিত করে জানি, জোর গলায় দাবি করতে পারি নিজেরই কাছে—

জীবন শুধু যন্ত্রণা নয়
জীবন তো অনেক জীবন্ত, বিশাল বিশাল।
জীবন অনেক বড়—বর্ষার মতো ঝরো-ঝরো
এই আসে এই ভেসে যায়—বহু দূরে যায়, বৃষ্টিধারায়
ধারাপাত অঙ্কের মতো—অসংখ্য ক্ষত-বিক্ষত
বুকে ভাসে স্মৃতিময় অরুণাভ মেঘ
এক জীবনে নারী ও পুরুষ
অর্ধেক অর্ধেক।
(এক জীবন : ইউসুফ পাশা)

জীবন আসলেই আমাদের ভাবনার চাইতে অন্যরকম। তাই 'অন্যরকম জীবন' সবাই বয়ে যায়, কেউ প্রকাশ্যে, কেউ বা গোপনে। কেউ বা ছাপার অক্ষরে পড়ে আনন্দিত হয়, কিন্তু খুঁজে পায় না সেই অনুভব যার জন্য, তার কাছে পৌঁছোনোর কোনো পন্থা। শেষ করি আজকের মতো, শুধু জানবেন—'আজ শুধু নবান্ন উৎসব, আজ সূর্যের দিন, শুধু আলো আর আলো।'

■ **বল্গা হারানো ভাষা, শরণাগত পৌণঃপুণিকতার**

০৯.০২.২০০৫
বুধ

বুকের কার্নিশে আড়চোখে তাকিয়ে, পাখি আছে বসে—হাসছে আমার অসহায়ত্ব দেখে। আমি সব সন্ধ্যা-আহ্নিকের পবিত্রতায়, মাগরিবের শান্তিতে মেনে নেই। বিল্বপত্র জড়ানো মন কোথাও রেখে স্বস্তিতে থাকি না।

আপনাকে বলেছিলাম আমার হবু জীবনসঙ্গীর সাথে প্রথম স্পর্শের ভাষা বিনিময়ে আমার অভিনয় জড়ানো অভিব্যক্তির কথা। সে আমাকে প্রশ্নাতীত ভালোবাসে, অনুভব করে। আমি নিজের ফাঁদেই বার বার ধরা। না, আর যাইনি সম্ভাব্য লাইফ পার্টনারকে নিয়ে কোনো গোপন ডেরায়, নীল নির্জনে, ঘড়ির কাঁটার প্রশ্রয়ে। ওকে ইদানীং আমার অসহ্য লাগা শুরু হয়েছে। এমনটাই হয়ে আসছে বরাবর। কিছুদিন পর পর আমি ওকে মোটেই সহ্য করতে পারি না। 'ও' আমাকে প্রায়ই বলে—'ভালোবাসো না তুমি আমাকে...'। আমি হাসি অথবা নিশ্চুপ থাকি। সত্যিই তো বাসি না। কেন বাসি না? এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র স্রষ্টারই জানা।

এক জীবনে বহুবার নিশ্চয়ই 'কঠিন সুন্দরী'—এই কম্প্লিমেন্ট পেয়েছেন। আপনি যে 'সুন্দর' এ কথা কেউ বলেছে! স্তুতি হলো? এই পত্রাঞ্জলি প্রায় শেষ হয়ে আসছে। আজকে 'নয়' তারিখ। এবার তো কিছু বাস্তব বলাই লাগে। মানুষের বাহ্যিক সব সৌন্দর্য এক সময় বিলীন হয়, ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য! যেন বা হীরকদ্যুতি। নিজের ভগ্ন ব্যক্তিত্ব দিয়ে বুঝি, ঐ একটা জিনিস 'মনুষ্য পদবাচ্য' এই সাধারণ স্তর থেকে একজনকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। আমি কখনো আকাশ ছুঁতে পারবো না আমার ব্যক্তিত্বহীনতার জন্য। তাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনার পায়ে পায়ে হাঁটি। দেখি আর বুক পুরে, নিঃশ্বাসে ফুলের গন্ধের মতো আপনার Scent of Personality নিই।

হাসছেন? হাসুন। জানি না ঐ হাসি কিভাবে কলমে ধরা যাবে। আমি শেষ পর্যন্তও জানি আমার কাগজ-কলম, ক্যানভাস-তুলি এখনো অতোটা সম্পন্ন হয়নি যে আপনাকে ধারণ করবে। তবে আমি বিশ্বাস করতে ভালোবাসি, কোনো একদিন আপনার স্নেহে ভর করে সেই যোগ্যতা অর্জন করে ফেলবো।

যখন প্রতিরাতে আপনাকে লিখি তখন আমার ঘোর অমাবস্যা—বর্ষা। ঐ যে জিনিসপত্র ছাড়াতে রাত এগারটার পর এক অদ্ভুত কাঁপুনি শুরু হয়, সেটা এড়াতে আমি আপনাকে লিখে চলি। একমনে ভাবি আপনি ড্রিঙ্ক করা ঘৃণা করেন। অনেক কষ্ট হচ্ছে সত্যি। তবে ভালোলাগাটুকু কষ্টের ওপর জয়ী হচ্ছে—এটাই যা আশার কথা এখন পর্যন্ত।

আমি খুব করে হেলাল হাফিজের 'উপসংহার' কবিতাটা ইদানীং আওড়াই—

আমার যতো শুভ্রতা সব দেবো
আমি নিপুণ ব্লটিং পেপার
সব কালিমা, সকল ব্যথা—ক্ষত শুষেই নেবো।

'পরীবানুর শেষরাত্রি' গল্পটার গুমোর আমি আপনাকে সরাসরি ফোনে বলাতে বলেছিলেন, 'তোমাকে দিয়ে হবে না।' আমার সাথে সাথে মনে হয়েছে 'আমি হওয়াতে চাই কী?' এ মুহূর্তে একটা জিনিসই কায়মনোবাক্যে চাইছি—আমার আঁধার কপালে আপনার দেয়া রৌদ্র-ফোঁটা যেন জ্বলজ্বল করে সবসময়, আমি যেন আর কোনো রঙিন জলে দীর্ঘ সাঁতার না দেই। শরাবকে বলতে চাই 'হে বন্ধু, বিদায়'। এ কাজটা কি আমাকে দিয়ে হবে? আপনি বললেই হবে।

'থাকবো ব্যাকুল শর্তবিহীন নত'—সারিয়ে দাও ছোট্ট বুকে থাকা গহীন ক্ষত যতো। দেবেন কি?

▪ মনোদেহ কাতর সম্রাজ্ঞীর, আলো নেভে আমার একান্ত পৃথিবীর

১০.০২.০৫
বৃহস্পতি

অক্ষমদের মাঝে মাঝে তীব্র বেদনাবোধ হয়। সেই ব্যথা অন্যের কাছে হয়তো বিরক্তিকর—যেমন আমার এখন একটাই বাক্য—আপনার মন খারাপ কেন? কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারবো না মুখোমুখি বা ফোনে কক্ষণো। আমার নিজেরই মনে হবে অনধিকারচর্চা করছি। তারচেয়ে আপনার 'ভীষণ' মাথাব্যথা নিয়ে চিন্তিত হওয়া আমার জন্য অনেক বেশি সহজ।

যেদিন মেজাজ খুব খারাপ থাকে, আমি পূর্ণ চাঁদের মতো খোলা শরীরে বসে থাকি নিজের রুমে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। একদম ঠাণ্ডা করে এসি চালিয়ে গ্লাস হাতে নিজেকে নিজের কাছে সঁপি। আজকে না পারলাম নগ্ন হতে, না পারলাম গ্লাসের সঙ্গী হতে। আমার থেকে থেকে মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে দেখছেন। জানি, এ ভাবনা খুবই হাস্যকর। মনের ওপর তো কোনো হাত থাকে না। তাই আমি চুপচাপ বসেই আছি।

ইচ্ছে ছিল, আপনি ইন্ডিয়া যাবার আগেই আমার নতুন যে বইটা মেলায় আসার কথা সেটাসহ আপনার সাথে দেখা করবো। প্রতিকূল পরিবেশ এখন এমন পায়ে পায়ে যে আমি সন্দিহান আদৌ এ ফেব্রুয়ারিতে আপনার কাছে কাঙ্ক্ষিত বইসহ পৌঁছুতে পারবো কিনা।

আজকে আমারও মন ভার। আপনাকে তাই আজ অফ্-ট্র্যাকের একটা কবিতা শোনাই—

আমাদের সব গল্পই জমে থাকে
ঝুলন্ত
পোলের ওপরে
শুন্‌শান জলের ছায়ায়
আমাদের সব গল্পই লেবেলবিহীন
কথা-উপকথা
দোয়েল পাখির মতো দুলতে-দুলতে যায়
আমাদের সব গল্পই...
চন্দনবাতাসা জমে থাকে
আমাদের সব শখ সাধ ধানের মড়াই
আলোচাল
ইঁদুরের ঠুকঠাক
আমাদের বাড়ন্ত উত্তাপ... ধার-দেনা
আমাদের সব গল্পই
কলার মোচার মতো
বৃষ্টিভেজা গাঢ় সারারাত
(আমাদের সব গল্পই: বেণুদত্ত রায়)

■ **তোমার মন খারাপ, আমার শরীর; তবুও বলবে আত্মিকতা নয় গভীর?**

১১.০২.২০০৫
শুক্র

চিঠি লেখা কোনোভাবেই দ্রুত শেষ করে উঠতে পারছি না। বেকার মানুষ যেমন মাত্রাতিরিক্ত ব্যস্ত থাকে, তেমনিভাবে আমার নির্দিষ্ট কোনো বিষয় না থাকায় (আপনাকে লেখার) কলেবরে তা শুধু বেড়েই চলে।

টেলিফোনে আপনাকে কালা জাহাঙ্গীর হুমকি দিচ্ছে? চিন্তার বিষয় সত্যিই। এই মৃত্যু উপত্যকায় বাঁচতে হলে একটু ডেমকেয়ার হতেই হবে। এটা কোনো ব্যাপারই না, তেমনটা ভাবতে শুরু করুন। আমি এরচেয়ে বেশি আর কী বলবো? আপনার সাহসী ভঙ্গির ছায়া মাড়াই সব স্বপ্নে। তাই আপনাকে টেনশন কমানোর জন্য এটুকু বলতে পারি—

বন্ধু তোমার ছাড়ো উদ্বেগ
অবারিত করো বক্ষ।
বড়ো আশা করে তোমার দুয়ারে
এসেছে বিরহী যক্ষ।
(মুঠোফোনের কাব্য: নির্মলেন্দু গুণ, কবিতা-১১৭)

খুব মজার কবিতা। আমার ভালো লাগে। ছোট ছোট শব্দে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসা।

শরীরে 'তৃতীয় মাত্রা' শুরু হয়েছে। এই স্তরে তুচ্ছ তুচ্ছ রোগ শরীরকে ভোগায়—গলা ব্যথা, সর্দি, কাশি, জ্বর, মাথাব্যথা, চোখ ঝাপসা ইত্যাদি ইত্যাদি। তবু আমি বেঁচে আছি আপনার দেয়া শুদ্ধতায় ভর করে। ভী-ষ-ণ কষ্ট, তার সাথে যোগ হয়েছে শ্বাস-কষ্ট। মনোবল হারাইনি। নিজেকে বলি—

এই তো শুরু হলো আমার যথার্থ ভ্রমণ
এই পথ যতো দীর্ঘ হয়, আমি খুশি।

তবে পথ দীর্ঘ না হোক মনেপ্রাণে চাইছি। শরীর দ্রুত ঠিক হওয়া দরকার। এতো কষ্ট আর নিতে পারছি না।

তারা ঝরার গতিতে রাত নেমেছে। ক্লান্তির তরাস আক্রমণ মন-দেহ সবটা জুড়ে। তবু এই জাগা কতোটা মধুর তা শুধু ঈশ্বর জানেন।

কখনো শাড়ি পরেন না? ইশ্, যদি আপনাকে শাড়ি পরা একদিন দেখতে পেতাম!

কী ভীষণ পালটে গেলো আমার নিরামিষ ছত্র-চরণ। বন্ধুরা বার বার চেপে ধরছে—'ঘটনা কী বল্? হুলস্থুল কোনো সম্পর্ক ছাড়া তো এমন কবিতা আসতেই পারে না!' আমি কিভাবে বলবো—পেয়ে গেছি শিরোনামহীন এক কবিতা, সম্পর্কের কোনো প্রাত্যহিক ছকে বাঁধা নেই যা! হাসি রহস্যময় হাসি, আর বলি—

তারচেয়ে তো এই ভালো
দেহমনের দ্বৈরথ থেকে দূরে,
আমার সকল কথারা থাকুক
আমার মনের অন্তঃপুরে।
(মুঠোফোনের কাব্য : নির্মলেন্দু গুণ)

■ **দুঃখ করো না, বাঁচো, নিজেকে উন্মাদ করে নাচো, বাঁচো...**

১২.০২.২০০৫
শনি

আকাশে অনেক মেঘজানি, সাদায় সাদায় জড়ানো বন্ধুর দেহখানি, চোখজোড়া বর্ষণ, বুকে অসহ্য ব্যথা, বলা না-বলা কতো কথা, কতো বছরের স্মৃতি; জানি, এভাবেই বাজছে মন জুড়ে সতীর্থ হারানোর আর্তি। আপনার প্রিয় বন্ধু, বিজনেস ম্যাগনেট মুকিত ছেড়ে গেলেন এ জগৎকে খুব অল্প বয়সে। আপনাকে শান্ত করার ভাষা আমার জানা নেই। এমন বিষণ্ণতা নিয়ে আমার শেষ চিঠিটা লিখতে হবে ভাবিনি। রাজার মতো বেঁচেছেন, রাজার মতোই চলে গেলেন। বেশিদিন ধুঁকেননি তেমনটাই ভাবছি।

আপনারা আমার চাইতে অনেক বেশি বিশ্বাসী বেহেশত-দোজখের ব্যাপারে তা অনুভব করি। সেই অনুভব থেকে বলছি—

কোনোখানে কোনো একদিন এক হবে তোমার-তার হাত
এক হবে এই দুটি নদী,
মন ভালো হয়ে যাবে, চলে যাবে সমস্ত বিষাদ
কোনোখানে কোনো একদিন হবে অন্তহীন জ্যোৎস্নারাত শুধু,
তোমার-তার দেখা হবে।
(মহাদেব সাহা)

বন্ধুকে ফিরে পাবেন গভীর অনুভবে। শুধু খুব বেশি কান্নার রং ছোঁবেন না। তাহলে দীর্ঘ বোধগুলো ফিকে হয়ে যাবে দ্রুত।

পত্রের যাত্রা শেষ হলো বলে। আজ রাত বারটায় আপনাকে পহেলা ফাল্গুন বলেই সমাপ্ত হবে পথচলা। আমার অনুভব কী বলে জানেন—আমার এই যে খুব সাধারণ শব্দগাঁথা আপনার জন্য, এগুলোর প্রত্যুত্তর যদি দেন তা হবে অনেক শাণিত, আমি হয়তো বুক চেপে বসে পড়বো অসহনীয় আনন্দে।

আপনি যতোবারই আমার লেখার প্রসঙ্গ আসে ততোবারই বলেন, আমি বিশেষ কিছু একটা হবো। আমাকে তো বন্ধু হিসেবেও জায়গা দিতে আপনি নারাজ। নিজেকে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ভাবতেই আপনি স্বস্তি বোধ করেন। নিজের সম্পর্কে ওয়েলউইশার, আমি কী ভাবি জনেন? শুনুন তবে—

আমি কোনোদিন কিছু ছিলাম না
আমি কোনোদিন কিছু হতে পারবো না
আমি তেমন অনায়াসে
লিখতে পারি না,
ভাবনা
আমার চোখকে ঝাপসা করে দেয়।
আমার বুকের মধ্যে অনেক ভালোবাসা
কিন্তু একমাত্র বিদায় নেয়া ছাড়া
আমার কারুর সঙ্গে
কোনো সম্পর্ক নেই।
আমি এখন
ভাবনাহীন দ্যাখার জন্য তৈরি
আমি এখন যাবার জন্য তৈরি।
(আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ)

আপনি যেমন সর্বত্র (আপনার ব্যবসার কাজে, সমাজসেবায়) চ্যাম্পিয়ন, আমি তেমন কখনো কোথাও হইনি। মাঝারি মানের সব কাজ আমার। তাই আপনার বলা কথাগুলো আমার লেখক জীবনে কতোটুকু সত্য হবে তা শুধু ওপরঅলাই বলতে পারবেন।

এদেশের মেয়েরা এখনো জীবিকা বলতে ধরাবাঁধা চাকরিই বোঝে। ব্যবসা! নারী ব্যবসায়ীর সংখ্যা খুবই কম। তাই আপনি যখন গতিতে গাড়ি চালিয়ে আসেন, আর শুনি বিজনেসের কাজে কোথাও যাচ্ছেন তখন সত্যিই ভালো লাগে। কারণ ব্যবসাতে প্রচুর ঝুঁকি। লাভ-লোকসানের সব সম্ভাবনাকে এক নিক্তিতে মেপে এই যে পথ চলার উদ্যোগ, তা কজনের থাকে! তখন তো শ্রদ্ধাটা আপনা থেকেই আপনার প্রতি আরো বেড়ে যায়, লাগামহীন। শব্দ করে বলতে মন চায়—'জয়তু, নারী'।

মেয়েদের একটা গুণ কী জানেন? তারা ব্যবসার ঝুঁকি নিক বা না নিক, অন্য কিছু পারুক বা না পারুক, তারা ভালোবাসতে পারে ছেলেদের চাইতে অনেক বেশি। তারা এখনো প্রেমের জন্য বহু পথ হাঁটার স্বপ্ন দেখে। তারা প্রেমিক-পুরুষকে গোছানোর কাঙ্ক্ষা রাখে। এটা আমার বার বার মনে হয়—মেয়েদের কারণেই হয়তো ভালোবাসা এখনো গোলাপে ফোটে।

যদি বলেন অবসেশন বা মুগ্ধতা (আপনার প্রতি আমার যে অনুভব তাকে), বলেছেন প্রথমেই; তার উত্তর যদি এভাবে দেই—

সবকিছু শেষ হয়ে যাক, শূন্য হয়ে যাক,
আমি এই মুগ্ধতা নিয়েই মরে যেতে চাই।

আপনার জায়গায় আমি হলে বলতাম—বড্ড বাড় বেড়েছে, বেয়াদব! আপনিও হয়তো বলেছেন, তবে আপনার চিরাচরিত অসম্ভব রকমের ভদ্রতার কারণে মনে মনে।

শুভ ফাল্গুন আপনাকে; ভ্যালেন্টাইন'স ডে'র অগ্রিম ভালোবাসা আপনার জন্য।

পত্রের আমি বিদায় নিচ্ছি। হয়তো আর কখনো এমন দীর্ঘ দিনের জন্য শব্দ নিয়ে আপনার কাছে ফেরা হবে না। আমার দিক থেকে আপনি স্বস্তিতে থাকুন, এটাই একমাত্র কামনা-প্রার্থনা।

মহাদেব সাহা দিয়েই শেষ করছি—

তোমাকে লিখবো বলে একখানি চিঠি
কতোবার দ্বারস্থ হয়েছি আমি
গীতিকবিতার,
কতোদিন মুখস্থ করেছি এই নদীর কল্লোল—
কান পেতে শুনেছি ঝরনার গান,
বনে বনে ঘুরে আহরণ করেছি পাখির শিস—
উদ্ভিদের কাছে নিয়েছি শব্দের পাঠ;
তোমাকে লিখবো বলে একখানি চিঠি
সংগ্রহ করেছি আমি ভোরের শিশির,
তোমাকে লেখার মতো প্রাঞ্জল ভাষার জন্য
সবুজ বৃক্ষের কাছে জোড়হাতে দাঁড়িয়েছি আমি—
ঘুরে ঘুরে গুহাগাত্র থেকে নিবিড় উদ্ধৃতি সব করেছি চয়ন;
তোমাকে লিখবো বলে জীবনের গূঢ়তম চিঠি
হাজার বছর দেখো কেমন রেখেছি খুলে বুক।

খোলা বুকে যন্ত্রণার প্রাসাদ গড়ে চলি আমি এই এক জীবন। তবুও আপনি/তুমি/তুই সুখী হউন/হও/হ, আমিন।

কাকলি

■ **যেতে যে হবেই, তুমি থাকো তবু হৃদয় জুড়ে**

১৪.০২.২০০৫
সোম

আদরের টুনটুনি পাখি,

তোমার দেয়া মোটামুটি বিশাল আকারের চিঠি পড়লাম। তুমি যে অদ্ভুত লিখো তা কি তুমি জানো? মনে হয় না। জানলে আমার মতো অপাত্রে তোমার এই মূল্যবান প্রতিভা ব্যয় করতে না। ইন্ডিয়া যাবো, সত্যিই ভীষণ জরুরি কাজ আছে। তা না হলে আমার ইচ্ছে ছিল এই ছুটিতে সেন্টমার্টিন যাবার। কতোদিনের পরিকল্পনা, অথচ বাস্তবায়িত করতে পারলাম না মোটেই।

তোমার মতো সম্বোধনহীন লেখা আমি লিখতে পারবো না। পারবো না কবিতার ভাণ্ডার খুঁজে এতো-এতো কবিতা তুলে আনতে। তোমাদের প্রজন্মের মানুষও এমন প্রবল আবেগে ভোগে তা তোমার এই চিঠি না পেলে আমি বুঝতাম না। আমি ভেবেছি তোমাদের ইমোশন ১৬০ শব্দের এসএমএস বা ই-মেইলেই সীমাবদ্ধ। তুমি সেই ভাবনায় ব্যতিক্রম জুড়ে দিলে। না পাখি, ইন্টারন্যাশনাল রোমিং ফোনে করাইনি। পাঁচ-সাতদিন দেখতে দেখতেই কেটে যাবে। অতো বেশি ভালো আমায় বেসো না, যা ধারণ করার ক্ষমতা আমার নেই। শোনো টুনটুনি, তোমার প্রিয় কবি পত্রীর ভাষাতেই বলি—'মৃত্যু এসে ফিরে যাবে এতো প্রেম দিও না আমাকে।'

তোমার চোখে আমি তারুণ্যের প্রতীক হতে পারি কিন্তু সময়ের হিসেবে আমার বয়সটা ফেলনা নয়। তুমি-আমি কোনো প্রশ্নহীন স্বাভাবিক সম্পর্কে আবদ্ধ হবার সম্ভাবনা এখন আর সত্যিই রাখি না। নিজের মনটাকে বুঝে নাও। নিধুবাবুর একটা টপ্পা তোমায় বলি—

তবে প্রেমে কী সুখ হতো
আমি যারে ভালোবসি সে যদি ভালোবাসিত
তবে প্রেমে কী সুখ হতো।
কিংশুক শোভিত প্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত
তবে প্রেমে কী সুখ হতো।
প্রেম-যমুনার জল, তা হলে হতো শীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল তাহে যদি না থাকিত
তবে প্রেমে কী সুখ হতো
তবে, তবে প্রেমে কী সুখ হতো।

পাখির জন্য ইন্ডিয়া থেকে কী আনবো গো?

■ **সময় হোক শুদ্ধতার**

১৫.০২.২০০৫
মঙ্গল

হামিং বার্ড,

বারো বছর বয়স থেকে ডায়েরি লিখো, এখনো তা সযতনে সংগ্রহ করছো! তুমি এখন ছাব্বিশ! দেখতে আরো কম লাগে। আমার তো নিজের চাইতে পাঁচ বছরের ছোট যে কোনো মানুষকে নিজের 'না-হওয়া' সন্তানের মতো লাগে। যদি সময় মতো বিয়েটা করেই ফেলতাম তবে তোমার চাইতে অল্প কিছু ছোট একটা বাচ্চা আমার অনায়াসেই থাকতে পারতো।

'যার নয়নে যারে লাগে ভালো', তা না হলে আমি প্রায় যৌবন পেরোনো একজন এখনো কারো সম্রাজ্ঞী হই কিভাবে! আমি তোমায় কেন ব্যথা দিতে যাবো, বলো? তোমার যেন কোনোদিন জগজিৎ সিংয়ের 'বেদনা মধুর হয়ে যায়' গাইতে না হয় সেটুকু ভালো আমি তোমায় বাসতেই পারি। মুন্নীর গজলটা শুনিনি তো! পাঠাবে আমাকে, খুব বেশি কষ্ট যদি না হয়?

সুন্দর করে কথা বলা মানে যদি কেবল শুদ্ধ ভাষাই হয় তবে তাতে আমি একমত নই। কে বলেছে তোমাকে তুমি ভালো বলতে পারো না! আমি তো ফোনে মুগ্ধ হয়ে শুনি তারুণ্যের গীতিকবিতা, ছাব্বিশের হৃদয়পাত্র উপচানো ঊর্মিরোলের নিনাদ। আমারই দুর্ভাগ্য বড় দেরিতে তোমার আগমন। আমি তোমাকে আমার মতো করে গোপনে বুকে তুলে নেই প্রতিনিয়ত, যেন বা এতোটুকু দাগ তোমার অবয়ব না ছোঁয়।

হামিং, আমাদের শৈশব-কৈশোরের বাংলাদেশ পালটে যাচ্ছে খুব দ্রুত। বদলে যাচ্ছে সময়ের দাবিতে অনেক প্রেক্ষাপট। ধর্মকে মানুষ ব্যবহার করা শিখেছে আপন স্বার্থে। তাই সাবধান, রাজনৈতিক কলাম ভেবে-চিন্তে লিখবে। অল্পশিক্ষিত মানুষরা খুব সহজেই বেহেশতে যাবার স্বপ্নে যাকে-তাকে মুনাফেক-মুরতাদ বলে যাচ্ছে একচেটিয়া। নিন্দিত যেন না হতে হয় তেমনভাবে পা ফেলো। তুমি নন্দিত হও লেখার ভুবনে এ আমার একান্ত চাওয়া। তোমাকে শুধু বলি, জীবনের সবচাইতে দামি বয়সটুকু কাটাচ্ছো বা পার করছো; এমন কিছু করে নিজেকে বিভ্রান্ত করো না যাতে পরবর্তীতে আফসোস করতে হয়।

কেমন চলছে লেখালেখি? তারপর আর খবর কী? অফিসে কী অবস্থা—ভালো?

অনেক কিছুই তো ছেড়েছো, এখন সিগারেট কম খাও। তুমি ভালো থাকলেই আমি খুশি হবো।

তোমার ভালোবাসা জটিল নয়, যৌগিক নয় ভালোবাসার বোধও। একটু সংযত হও, ভবিষ্যৎ ভেবে। আমি যে পাখিকে অনেক স্নেহ করি। পাখির ঠোঁটে আদর...

■ **ফিঙে ফিরুক নিরাপদে, আপন ডেরায়**

১৬.০২.২০০৫
বুধ

অল্প-সামান্য কিছু দান, এতেই এতো আনন্দিত কী করে হও ফিঙে! রাতটা এক আত্মীয়ের বাসায় থাকছি, তোমার এসএমএস পেয়ে মামুলি একটা ফোন দিলাম, তাতেই এতো অনন্দ! ইশ্, তোমার মতো যদি আমিও এমন অল্পতেই ভাসতে পারতাম আকাশ ছুঁয়ে!

তোমাকে দেখতে গেলাম অথচ একবার ঠিক করে তাকালেও না। আমার একটু একটু মেজাজ খারাপই লাগছিল। রাতে ফোনে বললে যে ইচ্ছে করেই তাকাওনি। তোমার সারাদিনের কাজ পণ্ড হয়ে যেতো তাহলে। সত্যি পাখি? তাহলে আমি কি আর যাবো না তোমার সামনে? তা-ই কি হয়? পেশার প্রতি তোমার এই কমিটেড মনোভাব কিন্তু আমার মোটের ওপর ভালোই লেগেছে।

শোনো ফিঙে, আমার মনটা কিন্তু ভীষণ খারাপ। ইন্ডিয়া ট্যুরটা বাতিল করেছি নানাবিধ কারণে। এই বিশাল বন্ধে আমি কী করবো বলো তো! এদিকে তুমিও ঢাকা ছাড়ছো সতেরো তারিখ রাতেই। আমার ইচ্ছে করছে তোমাদের সাথে জয়েন করতে। কিন্তু খুব ভালো মতোই জানি সেটা সম্ভব নয় কিছুতেই। আমার এই দুর্লভ খোলস এখন যে আর ভাঙ্গা কোনোভাবেই সম্ভব না, তা তো তুমি ভালোভাবেই বুঝতে পারো। তবু তুমি যে কিভাবে...

শোনো ফিঙে, তোমার এই একা একা এতোদূর অ্যাডভেঞ্চারে যাওয়া আমার একদমই ভালো লাগছে না। আমি খুব টেনশনে থাকবো। যখনই নেটওয়ার্ক পাবে ফোন করবে। বিচে রাতে মোটেই একা একা ঘুরবে না। In fact, সন্ধ্যার পর বিচ খুবই Insecured. সাবধানে থাকবে, সমুদ্র দেখেই হুঁশ হারিয়ে কবিতা লিখতে বসে যেও না। আমি চাই আমার ফিঙে পাখিটা অনেক অনেক সুন্দর কবিতা নিয়ে সুস্থ দেহ-মনে নিরাপদে ফিরে আসুক।

এই ফিঙে, একা একা সুন্দর দেখতে পাবো না—এ কেমন কথা? তোমার এক চোখ তো আমার থাকবে, আমরা দুজনে মিলে ঢেউ গুনবো। মজা করো, মন খারাপ করো না—আমি তোমার রৌদ্রছায়ায় সর্বক্ষণই সঙ্গে হাঁটি, বিশ্বাস করো।

সি-গাল আমার, দু ডানায় রোদের নকশা এঁকে খুব উড়ছো বুঝি! আমি চোখ বুঁজলেই দেখতে পাচ্ছি সমুদ্র সৈকত আমার ছোট্ট সি-গালের পবিত্র আলোতে কেমন নাচছে। পথে খুব কষ্ট পেয়েছো জেনে খারাপ লাগলো। যাই হোক, এটা তো অ্যাডভেঞ্চারেরই অংশ, তাই না! ওভাবে ভাবলেই পথের শ্রান্তি দূর হয়ে যাবে।

গিয়েছো মজা করতে, সেখানে নামতে না নামতেই ভালো লাগছে না, রুম বন্ধ করে হাবিজাবি খাচ্ছো—এটা কেমন কথা! খুব দুঃখ পেলাম গো বিষণ্ন সি-গাল!

রাতে ইন্ডিয়ান আইডল শেষে তোমাকে এসএমএস দিলাম, রাহুল বৈদ্যর বাদ পড়া দেখেই। তোমার মোবাইলের কোনো সাড়া নেই। হঠাৎ রাত দেড়টায় এটা কী লিখলে বলো তো—'why rn't u with me?' আমি কেন তোমার পাশে নেই—এ কথা নিজের মনে নিজে ভাবতেই ভেসে উঠলো তোমার রাগ-ক্ষোভ-ব্যথা মেশানো ছোট্ট মুখটা। পারলে কি আমি থাকতাম না! যা দিতে পারি না, তা মনে করিয়ে দিয়ে কি আমাকেও ক্ষত-বিক্ষত করতে চাচ্ছো, যা নিজে প্রতি মুহূর্তে হচ্ছো? তাতে কি দুজনের কারোরই সুখ হবে?

কখনো গৎ-বাঁধা সেসব কথা বলবো না—পাগলামি বন্ধ করো। আমি তোমাকে একটা কথাই বলবো, ভালোবাসাকে লালন করতে শেখো নিজের গভীরে। তুমি হয়তো এক্ষুণি বলে বসবে—একা একা এই লালন কী যে কষ্টের!

বুঝি, জানি—তোমার ঐ অদ্ভুত সৌন্দর্যের বয়সটা যে আমারও এককালে ছিল গো পাখি! প্রেমে কেউ প্রাজ্ঞ হয়, কেউ বা দেবদাস। আমার সি-গাল যদি দেবদাস হয়, তবে তা আমার একদমই ভালো লাগবে না—বলে দিলাম খোলাখুলি। বাকি সিদ্ধান্ত পাখির একান্ত নিজের। তুমি না ফেরা পর্যন্ত লেখাটা শেষ করছি না। তোমার স্টাইলে চেষ্টা করছি চিঠি লেখার।

শোনো বাবুই, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে অফিস থেকে ছুটি নিয়ে আউটিঙে গিয়েছো। তুমি এনজয় করতে না পারলে নিজেকে অপরাধী ভাববো। একটু সহজ হও, বন্ধুদের সাথে প্রাণ মেলাও, দেখবে ভালো লাগবে। এই যে আমি তোমার হাত ধরলাম, তুমি টের পাচ্ছো?

■ **পাখির ডানায় এঁকে দিলাম রোদ্দুরে নকশা**

১৯.০২.২০০৫
শনি

সকাল সাড়ে দশটা আমার জন্য ভোর বলা চলে। তুমি এতোদিনে এই তথ্য জানো। অনেক কষ্টে হাতড়িয়ে বাজতে থাকা মোবাইলটা টানলাম কাছে। তোমার গলা বুঝতে পারিনি, মনিটরের দিকে তাকাইনি। বোঝো, তোমার সম্রাজ্ঞী কেমন কুম্ভকর্ণ! যখনই আমি বললাম 'কে?' তখন ওপাশ থেকে একরাশ অভিমান জড়িয়ে তোমার নাম বললে। আমি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসলাম। ইশ্, না জানি আমার পাখির ছোট্ট বুকে কী ব্যথা দিলাম! তোমার বুকের অথবা সমুদ্রের গর্জন মিলেমিশে শুনলাম মোবাইলের ওপার থেকে। ঠাণ্ডা লেগে তোমার ভয়েস তো একেবারেই পালটে গেছে, তাই বুঝতে আমার সময় লেগেছে। প্লিজ, রাগ করো না।

তুমি ট্যুরটা উপভোগ করার চেষ্টা করছো জেনে ভালো লাগলো। কে জানে পানিতে কতোক্ষণ কাটাচ্ছো বেহুঁশ হয়ে। কাশি বেড়ে না গেলেই হয়, তার ওপর সাঁতার জানো না। একটু সাবধানে থেকো।

ভর-সন্ধ্যায় বিচ থেকে ফোন করলে। আমি তখন মহররমের রোজা ভেঙ্গে ইফতার করছি। বার বার বললাম সন্ধ্যায় বিচে থেকো না। আমাকে অভয় দেবার জন্য বললে কী বিচে র‍্যাব আছে, নাকি সত্যিই ছিল? তোমার কথাটাই বিশ্বাস করতে চাই।

▪ মনের 'পরেতে মন, পাখির সাথে সম্রাজ্ঞীর কলম আলাপন

২০.০২.২০০৫
রবি

পাখি গো, মজা মানেই কি বেশুমার ড্রিঙ্ক করা আর অগুনতি সিগারেট পোড়ানো! যে জিনিস ছেড়েছো তাকে আর আনন্দ করার ছলেও আঁকড়ে না ধরলেই খুশি হবো। তুমি কি চাও না তোমার সম্রাজ্ঞী আনন্দিত হোক তোমার আচরণে? যদি চাও তবে আর যাই করো ড্রিঙ্ক করো না, অন্য বন্ধুরা করলে করুক—এ আমার একান্ত অনুরোধ।

তুমি ২০শে ফেব্রুয়ারি যখন ঢাকা ফিরবে তখন আমি হাতিয়ার উদ্দেশে রওনা করবো। ঢাকা ফিরেই আমাকে ফোনে না পেয়ে আবার ঠোঁট ফুলিয়ো না যেন। আমার একটা আউটিঙের ভীষণ প্রয়োজন ছিল যে! তাই যাচ্ছি। নেটওয়ার্ক যদি পাই তবে অবশ্য অবশ্যই দোয়েলের শিস্ শুনবো, মন খারাপ করো না।

▪ জলের সিঁথিতে পাখির ওড়াউড়ি ক্লান্তিহীন

২১.০২.২০০৫
সোম

দোয়েল দুন্দুভি,

চরে আটকে আছে আমাদের লঞ্চ গত দু ঘণ্টা। নেটওয়ার্ক আসে যায়। তোমাকে ফোন করলাম। কিভাবে-কখন ফিরলে কিছুই জানতে পারিনি বলে একটু টেনশনেই ছিলাম। বললে ঢাকাতে ফাগুনে জল নেমেছে, হালকা বৃষ্টি; এখানে পরিষ্কার আকাশ। রাত এগারটার বেশি। চাঁদ প্রায় পূর্ণই বলা চলে, তোমার কণ্ঠে কবিতা শুনতে ইচ্ছে করছে। সেটা বুঝেই মনে হয় আমার দোয়েল পাখি এসএমএস দিলে। কিভাবে এমন ইন্‌স্ট্যান্টলি স্থানানুযায়ী, সময়ানুযায়ী কবিতার লাইন মনে করো! আমি যখন ভাবছি এই দু ঘণ্টার আটকে থাকা তো সইয়ে নিতে হবেই, তখন তুমি এসএমএস দিলে—

শূন্যে ভাসে মেঘের জলাশয়
এই জীবনে সবকিছুই তো সয়।
(ফুটেছে ফুল, বিরহী তবু চাঁদ—মহাদেব সাহা)

সত্যিই তখন আকাশে ছেঁড়া মেঘের আনাগোনা, চাঁদ প্রায়ই ঢেকে যাচ্ছে। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে নিজের একাকিত্বের দৈর্ঘ্য মাপছিলাম মনে মনে, তুমি লিখলে—

আকাশ কেমন একলা পড়ে থাকে
শূন্যতাকে দু হাত তুলে ডাকে।
(আকাশ—মহাদেব সাহা)

এই দোয়েল, তুমি কি ইদানীং দূর থেকেও আমার প্রতিটি ভাবনা পড়া শুরু করেছো নাকি! দেখো, আমার শরীর কেমন শিরশির করছে তোমার এসএমএস পড়ে! ছুঁয়ে দেখো।

আমি তো আজ সারাদিন নদীতে ছিলাম। তুমি মহাদেব সাহার কবিতা প্রায়ই Quote করো, মনে হয় তোমার প্রিয় কবিদের একজন। তার একটা কবিতা দিয়ে তোমাকে লেখা আজকের চিঠি শেষ করছি—

তুমি ভালোবাসার কথা শুনতে চাও
তাহলে নদীর উৎসের কাছে চলো,
চলো নদীর জন্মের দেশে যাই
সেইখানে ভালোবাসা আছে, অন্যকিছু নাই;
(ভালোবাসা ও নদীর জীবনী—মহাদেব সাহা)

▪ হৃদয় কপাট হাট, পাখির সামনে পসরা...

২২.০২.২০০৫
মঙ্গল

নিশ্চুপ বুলবুল,

ঢাকায় ফিরলাম, প্রত্যাবর্তন আবার আপন ভুবনে। এখন রাত এগারটা। না তোমার ফোন, না এসএমএস। এমন তো সচরাচর করো না। কী হলো আবার! তুমি হয়তো ভাবছো আমার একান্ত সময়ে তোমার প্রবেশ করাটা অনুচিত হবে। শোনো, মাঝে মাঝে অনেক যুক্তিবাদী মানুষেরও ভাঙচুর চালাতে মন চাইতেই পারে। আমি এখনো অপেক্ষা করছি তোমার সাড়াশব্দের। তোমার অবস্থান থেকে যা করা সহজ, আমার জন্য তা নয়, তা তো তোমার অনায়াসেই বোঝার কথা।

তুমি যখন একেবারেই স্পিকটি নট্, তখন আজ আমি একা একাই কিছু কথা বলি। একটু ঘনিষ্ঠতা হলেই মানুষ আমাকে প্রথম যে প্রশ্নটা করে তা হলো 'বিয়ে করিনি কেন।' তুমি একবারও আমাকে এই কাঠগড়ায় দাঁড় করাওনি। যেন বা আমি যে ব্যাচেলর (অনেকেই বলবে নারীদের ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রযোজ্য নয়, এখানে

অবিবাহিতা হওয়া উচিত) এটাই আমাকে পছন্দ করার তোমার একমাত্র কারণ, মাঝে মাঝে তোমার ভাবভঙ্গিতে আমার তাও মনে হয়েছে। অন্য অনেক নারীর মতোই আমারও বিয়ে নিয়ে কম স্বপ্ন ছিল না, বলতে দ্বিধা নেই এখনো কমবেশি আছে। কতো ছোট থেকে আমার ডিসিপ্লিনড লাইফ, বাবার কল্যাণে। বার বার ভেবেছি আর একটু গুছিয়ে নিই, তারপর সংসার করবো মন দিয়ে। এর মধ্যে বিয়ের প্রস্তাব এসেছে, গেছে। কখনো মনে হতো এবার বুঝি বিয়েটা হয়েই গেলো! নাহ্, ফুস্, হলো না তো! মেয়ে নামকরা ব্যবসায়ী; তিন মাসে দু বার দেশের বাইরে যায়; সে আবার কী! উরিব্বাপস্, একে দেখি সবাই চেনে! এর পরিচয়ের আড়ালে তো লুকিয়ে যাবে চিরকালের স্ত্রী উতরোনো স্বামীর পরিচয়। নাহ্, একে বিয়ে করা যাবে না। আশপাশের অনেকের জীবন, নিজের সময়ে এসব টানাপোড়েন দেখতে দেখতে কখন যেন আমার ভেতরে এক ধরনের Sense of Insecurity কাজ করা শুরু করলো। কেবলই মনে হতো—যে জীবনসঙ্গী হবে সে যদি আমাকে প্রাপ্য সম্মান না দেয়, আমি যদি তাকে শ্রদ্ধা করতে না পারি, তখন কী হবে? এসব দ্বন্দ্বে কখন জানি না বয়সটা বেশ বেড়েই গেলো। ব্যবসা, আত্মসত্তা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টুকটাক আনাগোনা, লেখালেখি সব নিয়ে আমি আমার মাঝে আরও গুটালাম।

অনেকদিন ধরে একটা কাজই সযতনে করি, তা হলো 'ঝামেলা' এড়িয়ে চলা। নিজের কাছে নিজেকে আশ্রয় দিতে গিয়ে আর অন্যকে স্পেস দেবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি তাই মনে করতাম। আমি কিন্তু মনের দিক থেকে মোটের ওপর সরল নই, বেশ জটিল। তোমার আহ্বানে, তোমার বন্ধুত্বের ডাকে সাড়া দিতে তাই বার বার দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি। এই যে তোমার অনুভবকে আঘাত না করে, নিজের স্থান থেকে না টলে সব ব্যালেন্স করা, তাও আমার কাছে এক ধরনের ঝামেলাই ছিল সেদিন পর্যন্তও। তোমার সুতীব্র ভালোবাসা আমি প্রতি মুহূর্তে টের পাই, বুঝতে পারি তোমার অসহায়ত্বের তীক্ষ্ণ জোয়ারটুকুও। সেই তুমি অন্য জায়গায় বিয়ে করছো দু হাতে বুকের ক্ষত ঢেকে। আমার একাকিত্বের কষ্ট তোমার এই বেদনার কাছে কিছুই নয়।

বুলবুল, এতো কিছুর পরও আমি কিন্তু জীবনের প্রতি ভালোবাসা হারাইনি। আমি আমাকে ভালোবাসি, সুসজ্জিত থাকি, অন্যের সপ্রশংস দৃষ্টি উপভোগ করি। অন্য কেউ হলে কোনোদিন বলতাম না, কিন্তু তোমাকে বলি—তোমার ঐ পবিত্র স্বর্গীয় ভালোবাসার বোধকে আমার উপেক্ষা করার শক্তি নেই। তুমি তো প্রায়ই নিজেক বিবিধ উপায়ে কষ্ট দাও, তাই বুদ্ধদেব গুহের 'অবরোহী' বইটা থেকে তোমাকে কিছু কথা বলি যা আমি আমার জীবন দর্শনে মেনে চলি—

> 'নিজেকে ভালোবাসো, নিজের জীবনকে, নিজের পারিপার্শ্বিককে ভালোবাসো। তুমি আছো, তাই পৃথিবী আছে। তোমাকে ঘিরেই তোমার পৃথিবী চারধারে আবর্তিত হচ্ছে। তোমার পথই সায়ন পথ। তুমি যেদিন মরে যাবে আমি কিন্তু বারো ঘণ্টাও তোমাকে মনে রাখবো না। অন্য কেউই রাখবে না। পৃথিবী চলবে নিজের মনে। যার-যার পৃথিবী ঘুরবে তাকে-তাকেই কেন্দ্র করে। এটাই ঘটনা! পৃথিবীর সময় নেই, পেছনে চেয়ে, পা ছড়িয়ে বসে কাঁদার।'

অভিমানী বুলবুল, তোমার-আমার কোনো শিরোনামযুক্ত সম্পর্ক হবে না সত্যি। কিন্তু এটুকু জানবে, যে কোনো বিপর্যস্ততায়-আনন্দে আমি তোমার পাশেই থাকবো। মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক তাতে স্থায়ী বলে কিছু নেই। সম্পর্কের ভাঙচুরে ভর করে পৃথিবী খুব দ্রুত এগোচ্ছে সত্যি। তবে এটাও সত্যি সব ভাঙনেই নির্মাণের সম্ভাবনা লুকানো থাকে।

পাখি গো, প্রিয় কিছু ছাড়লে বাঁচার কোনো অর্থ থাকে না। জীবনের প্রতিটি মিনিটই তবে অসহনীয় একেকটি ঘণ্টা হয়ে দাঁড়ায়। কেন আমি জেনে-শুনে তেমন অর্থহীনতায় নিজেকে ডোবাবো? তুমি তোমার রুপালি ডানা মেলে যেমন খুশি থাকো আমার বয়সী রোদ্দুরে। একটু হাসো...

▪ নিশা লাগে গোপনে, শান্তি কি পাবো মরণে?

২৪.০২.২০০৫
বৃহস্পতি

কাল রাতে (২৩.০২.০৫) তোমার সাথে কথা অসমাপ্ত রেখেই আরেকটা ফোন ধরতে হলো। শরীর খারাপের জোয়ারে ভুলেই গেলাম আমার রাতজাগা পাখিটা না ঘুমিয়ে বুকে ফোন নিয়ে বসে আছে। তারপর তো তোমার এসএমএস। হুড়মুড় করে আবার তোমাকে ফোন করলাম। যেখানে আমি বলবো আমি কেমন বিব্রত, সেখানে তুমি আমাকে বার বার বিশ্রাম নেবার কথা বললে। পারোও বটে!

তুমি-আমি এমনভাবে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত যে পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে সবই আমাদের কাছে গৌণ। মানুষের জীবন এদেশে কতো সস্তা তা ভাবি কখনো কখনো। একটু বাতাস, দেড়শ মানুষ লঞ্চ নামক এক যানের ডুবিতে ফুটুস। দুঃখের হাসি আসে আমার। এক জনের মৃত্যু সমান একটা ছাগল। আচ্ছা বলো তো, এদেশের রাজনৈতিকরা কবে মানুষ হবে, মানুষের প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধি করবে, দেবে অন্যকে যথোপযুক্ত সম্মান! তুমি তোমার স্বভাবসুলভ তাচ্ছিল্যে বলবে, 'কাভি নেহি।' কিন্তু তুমিই বলো, এটা কি হওয়া উচিত!

এই, তোমার বই পড়লাম। কী করেছো বলো তো! আস্ত একটা বই আমার জন্য? নিজেকে বহুদিন পর পৃথিবীর বুকে বেশ মূল্যবান মনে হচ্ছে। শোনো পাখি, তোমার টু বি লাইফ পার্টনার যদি এই ব্যাপারটা জানে তবে কী হবে বলো তো! তুমি কি বলবে সেও তো আমার জানা—'প্রতারণা প্রলোভনে আজ, জীবনের কাটে বারো মাস।' শেষ পর্যন্ত জানো তো বঞ্চনাটুকু মানুষ হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে নিজের সাথে নিজেই করে?

জানি, আমার পাখির সাহসের কোনো অভাব নেই। তথাপি আমি গোপন ম্যানগ্রোভ। ঐ যে ঝামেলা তা এড়াতে চাই সর্বান্তকরণে। তোমার বিয়ে অথবা বৌভাত যে কোনো একটা প্রোগ্রামে আমি যাবো। তুমি বলে দাও কোনটাতে গেলে তোমার ভালো লাগবে। আমি এসব হিউজ গ্যাদারিঙে বহুদিন ধরেই যাই না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি...তুমি তো জানোই, একেবারেই ভিন্ন। জানাবে কিন্তু কোনটায় আমি থাকলে তোমার ভালো/খারাপ লাগবে।

নাইটিঙ্গেল আমার, এমন তরাস শৃঙ্খল যদি না থাকতো প্রতি পদক্ষেপে তবে বিজয়তাজিওডং-এর চূড়ায় দাঁড়িয়ে আমি নিঃসংকোচে বলতাম—তোমাকে চাই। পারি না, আমি কিছুই পারি না।

আমি পারি শুধু তোমাকে মনে মনে এক জীবনের গল্প শোনাতে।

আমাদের এই শয্যা জ্যোৎস্নারাতের করপুটে, আমি তোমাকে নিঃসঙ্গ নারীকথা শোনাই সারারাত। শুভরাত্রি।

▪ মেরেছি ভুজঙ্গ তীর, হচ্ছি নিজেই চৌচির

২৫.০২.২০০৫
শুক্র

পিউকাঁহা পাপিয়া,

দুর্লভ ছুটির দিন তোমার। একবার জানতেও চাইলাম না—'কী করলে সারাদিন?' বিকেল থেকে তোমার উচাটন এসএমএস পাচ্ছি, আর নিজেকে বাঁধছি কঠোর সংযমে। পাড়ায় পাড়ায় সন্ধ্যা নামছে যখন, তখন আমি ভাবছি আমার উত্তরহীনতা তোমার মনে কেমন ঝটিকা আঁধার নামাচ্ছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওড়না ওড়ানো বাতাসে নিজের চোখ পেতে দিই। তোমার ছোট ছোট চাওয়াগুলোকে ফিরিয়ে নিজে যে কষ্ট পাই—তোমাকে দেই, তা ভুলতে। কে জানে বাসন্তী পবন হয়তো আমার নোনাজল পেয়ে তার শুষ্কতা ভোলে আনন্দেই!

পিউকাঁহা, দু-এক মাস পেরোলেই তুমি ডাবল হবে, সেই তুমি এখনো অমুক-তমুককে নিয়ে বাইক হাঁকাচ্ছো। তোমার পার্টনার জানলে কী হবে একবার ভাবো তো! এমন মুহূর্তবাজ কেন হও গো! অন্ধকারের ঘোর অকারণে টেনে আনছো, তোমার কি এটা একবারও মনে হয় না!

জেনারেশন গ্যাপে তোমাদের বুঝতে পারা সত্যিই কঠিন। এতো অপছন্দে-অসহ্যতে কেন যাচ্ছো বিয়ে করতে? তুমি বলবে—সে যে তোমাকে অনেক ভালোবাসে, এটাই তার একমাত্র গুণ। শোনো পিয়া, এই যে তুমি আমাকে ভালো পাও, আমিও তোমাকে, সেখানে কিন্তু কিছু না কিছু প্রত্যাশা থাকেই—যতোই তুমি বলো আমার কাছ থেকে তোমার কিছু চাইবার নেই। একটা ফোনের বিপরীতে আরেকটা, মেসেজের বদলে মেসেজ—এগুলো না পেলে ঠিকই তুমি অভিমান করছো, আমিও থমকাই। তোমাকে যে ভালোবাসছে সেও কিন্তু এমনটাই চাইছে। অথচ তুমি তার ফোনে বিরক্ত, কখনো মোবাইল অফও করছো। অদ্ভুত বিকেলে—তোমার ভাষায় ইরানি কার্পেটের মতো তুলতুলে বিকেলে তুমি আমাকে তোমার পাশে চাইলে। 'সে' এসএমএস পাঠাতেই তুমি অন্য আরেক বন্ধুকে ফোন করে সন্ধ্যার একাকিত্ব সিগারেটের ছাইয়ে ডুবালে,বাইকের স্পিডে বুকের স্থবিরতা উড়ালে। সে পড়ে রইলো অবহেলে।

এ এক আরোপিত যন্ত্রণা, পিয়া। তুমি পুড়ছো, ভালো লাগে? আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি কী কষ্ট এমন সব প্রহরে। তোমাকে এড়াতে যখন মোবাইল অফ করলাম তখনই তোমার দেয়া নির্মলেন্দু গুণের মুঠোফোনের কাব্যের সেই লাইন দুটি ঝলসে উঠলো—

তুমি ছিলে তাই মুঠোফোনে ছিল হাসি
তুমি নেই তাই মুঠোফোনে শুনি কান্না।

স্বপ্নের নিশানা জানি। ভাবছি গভীর মনোযোগে। তুমি আমাকে পথে নামিয়েছো তাও বুঝছি। কিন্তু বাবুই কী করবো বলো! বাসার পাশ দিয়ে ট্রেন যায়, মনে হয় ট্রেনে করে কোনো অজানায় চলে যাই। কমিয়ে দিই তোমার মাত্র শুরু হওয়া জীবনের অকস্মাৎ জটিলতা। পারি না। আমি তোমাকে আমার পাঁজরের ইতিহাস দেখানোর জন্য অপেক্ষায় থাকি, প্রতীক্ষা করি আমার পোড়া মহাকাশের আগুন নেভাতে তুমি দমকলের মতো আসবে। পাখি গো—

আমার সঙ্গে বসো না
নষ্ট হয়ে যাবে।
আমি যে পথ যাই না ফেলে,
পথ কুড়িয়ে চলি।
চলতে চলতে রঙ্গরসে
অঙ্গে ঢলাঢলি।
আমার সঙ্গে চলো না পথ—
ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।
(মুঠোফোনের কাব্য, কবিতাক্রম ১৩৩, পৃষ্ঠা ৯৮)

উপেক্ষা আমার রক্ষাকবচ। সেই বয়স নেই বলি—বিভ্রান্তিতে তোমাকে চাই। হ্যাঁ, এটুকু চাই—তোমাকে সুস্থ স্বাভাবিক যাপনে যেন পাই। আমাকে একটু কম ভালোবাসো। এমন কিছু আমাকে দিও না যা ধারণ করার উপায় আমার নেই। এক একটা দিন তোমাকে এড়াই। আমার সূর্যের ঘোলা চোখ, চোখের পাথর ফাটিয়ে জলমিছিল, বুকের সুর মচকানো, বুকে খরার আগুন, ধুপ-ধুনুচি সব জুড়ে কেবল দুঃখের প্রদীপের আলোর নাচন। তোমাকে তো এসব বলা যায় না। তুমি আমাকে সত্যিই আর অমন ব্যাকুল হয়ে ডেকো না। আমি ভালো নেই গো, পিয়া।

আমি তোমার উচ্চারণে রাজহংসী। এদিকে রাজহংসীর ঠোঁটে এলাচ গন্ধ, বুকে লোকলজ্জা ভুলে সব খুলে দেবার দুন্দুভি. তোমার জন্য নিজেকে সাজাবে বলে চন্দনের বাটি—সে কিছুই সম্মুখে আনতে পারে না। তার বেদনা কে বুঝবে? মন কেন এমন অবিবেচনায় মাতে? সে সব পেতে চায়? 'সবটুকু' কতোটুকু?—একরত্তি। আমি খরস্রোতে বিছানা-বালিশ সহ পা ডুবিয়ে দেখে যাচ্ছি নির্ঘুম রাত্রি। আমার মুখোমুখি তোমার আর্ত মুখ—অদ্ভুত বিকেল। 'Can we go for a hang out?' তোমার জিজ্ঞাসায় আমি অবধারিতভাবে 'না' উচ্চারণ করি। আমি হ্যাঁ বলতে পারি না। ফাগুনের হাওয়ায় জলনৌকা ভাসিয়ে পাখির দু ডানা বুকে চেপে পার করি দীর্ণ রাত। আমার স্বপ্নেরা সমাজের দেয়া কারফিউয়ে অসাড় পড়ে রয় ঝরা পালকের মতো। হায়, দী-র্ঘ-শ্বা-স...

▪ ফেরালাম দু চোখের দৃষ্টি, মনে মনে করি তোমাকেই সৃষ্টি

২৬.০২.২০০৫
শনি

বাস্তু কবুতর,

তোমাকে যখন লিখতে বসি তখন আর কোনো কিছুর চিন্তা আমার আসে না। আমিও তোমারই মতো শব্দখেলায় মেতেছি, অথচ এ আমাকে মানায় না খুব ভালো করেই জানি। তোমাকে প্রশ্রয় দেয়া কোনোভাবেই উচিত হচ্ছে না। ইচ্ছে ছিল তোমার চিঠিটার ধাপে ধাপে উত্তর দেবো, হয়নি। আমি তো বলেছি শুধু আমারই কথা। তুমি তোমার চিঠির এক জায়গায় বলেছো—'আমার আঁধার মুখ মুছে নেবে সম্রাজ্ঞীর দেয়া আলোর রুমালে।' এ কথাটা সব সময় মনে রেখো। ঐ নেশার জগতে যেন আর ফিরতে না হয়। আমি থাকি বা না থাকি, আমার সর্ব্বোচ্চ ভালোটুকু কিন্তু তোমাকেই দিয়েছি পরম মমতায়। তুমি যেমন ভাবো তেমন বর্ণাঢ্য, বলার মতো কোনো জীবন আমার আদপেই নেই। তুমি আমার সম্পর্কে স্পেশাল কিছু জানো না, কারণ আমার মধ্যে তেমন বিশেষ কোনো বিচ্ছুরণ নেই।

কী যেন লিখেছিলে—দেবার ব্যথা বাজে আমার বুকের তলে, নেবার মানুষ জানি নে তো কোথায় চলে...শোনো পারিন্দা, যাকে জীবনে জুড়ে নিচ্ছো স্বেচ্ছায় তাকেই অল্প-অল্প করে দিতে শেখো। সেই তোমার নেবার মানুষ, ভুল করো না।

কষ্ট পাও, ঋদ্ধ হও—বদলে যায় তোমার লেখার গতিপথ। সেদিক থেকে আমার দেয়া ব্যথা তোমার ভাষ্যমতে শাপেবরই হয়েছে নাকি বলো! হাহ্, হাহ্, মজা পেলাম, হালকা আফসোসের সাথে।

আমাকে তুমি সম্বোধন করো না। কী আসে যায় সম্বোধনে? কখনো মনে করো না হৃদয়ের ডাক শুনতে পাই না। এক জনমে মানুষের সামনে কতো কী আসে তা

আরেকটু বয়স হলে বুঝবে-জানবে। কোনো একদিন বুঝবে এই একলা নারীর ব্যথা, সে যখন তোমার বাড়ানো হাত বার বার ফেরায়, তার তখনকার যন্ত্রণা।

তোমার 'স্বপ্নাক্রান্ত' কবিতাটা পড়ে মনে হলো তুমি যদি অর্বাচীন হও, তবে আমি কী? আমি টুটেনখামেনের মিশর, অনেক অনেক প্রাচীন। যে তোমার ঐ উৎকর্ষিত হর্ষে, বিষাদ আনে অজান্তে, সজীবতাকে ঢেকে দেয় মমির মতো শৈত্যে।

অমিতাভ দাশগুপ্তের কবিতার মতো আমাকেও কিছুদিন পর তিনশর বেশি মাইল ডিঙিয়েই আসতে হবে। আমি দেশে থাকা আমার ব্যবসা মোটামুটি ভাঁজ করে ফেলেছি; হুঁ, পালিয়ে যাচ্ছি বলতে পারো। তোমাকে বলতে পারিনি আতঙ্কে, আশঙ্কায়। পাখি, আমার একলা পাখি, এমন কোনো বিধান নেই যাতে তোমাকে মুড়ে আমার বুকে রাখি। তাই...চোখের আড়ালের ব্যবস্থা, তোমার নবজীবন সাজুক নির্বিঘ্নে।

ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্য, হীরকদ্যুতি—ভালোই বলেছো। শুনেছি ডায়মন্ড কাটস ডায়মন্ড। সেই সুযোগ যাও বা এলো, তাও বড় বেশি দেরিতে, তের বছরের ব্যবধানে, যা প্রাচ্যে বড্ড বেমানান। তোমার সাথে আমার মাত্র তের বছরের গ্যাপ!

তোমার কপালে আর কক্ষণো আঁধার বাসা বাঁধবে না দেখে নিও। যে এমন করে অন্যকে ভালোবাসে-ভালোবাসায় প্রত্যাশাবিহীনভাবে, সে অন্যের ক্ষতি তো করেই না, সে নিজের ক্ষতিও করতে পারে না।

শাড়ি পরি, তবে হয়তো বছরে দু-এক বার। আরামবোধ করি না এই পোশাকে। সামলাতে পারি না। তাছাড়া শরীর দেখানো আমার বড্ড বাজে লাগে। তোমাকে শাড়ি পরার একটা ঘটনা শোনাই। সেবার পাকিস্তানে গিয়েছি সার্কভুক্ত দেশগুলোর নারী ব্যবসায়ীদের সম্মেলনে। বিকেলে মিটিং, সেখানে বাংলাদেশের মেয়েদের অফিশিয়াল ড্রেস হলো শাড়ি। আমি তো পরতে হবে তাই আলগোছে একটা শাড়ি নিয়ে গেছি। শাড়ি কেনার পর ব্লাউজসহ যেভাবে ছিল সেভাবেই নিয়ে গিয়েছি। এর মাঝে পরা হয়নি। অনুষ্ঠান শুরু হবার দু ঘণ্টা বাকি। গ্রুপের ফিরোজা নামের আরেক মেয়ে আমাকে শাড়ি ডজন খানেক সেফটিপিনসহ পরালো। কিন্তু ব্লাউজতো আর হয় না। শেষমেষ একটু বড় স্পোর্টস ব্রা, তার উপর ব্লেজার পরে মিটিঙের ঝক্কি পার করা হলো। হায়! তারপর ডিনার। বারবিকিউ নাইট। সেই জায়গা এতো গরম! সবাই কোট-ব্লেজার খুলে ফটাফট চেয়ারের গায়ে রাখছে। আমি শুধু ঘামলাম আর ঘামলাম। ব্লেজার খুলতে পারলাম না। আমার যে ব্লেজারের নিচে কিছু নেই। এবার বোঝো, আমি কেমন শাড়ি পরি!

যাবার আগে তোমার সাথে শাড়ি পরে এক রাতে ডিনার করবো, কথা দিলাম।

পাখি, আমার ছোট্ট পাখি, আরো লিখা মানেই মায়া বাড়ানো, নিজেকে জড়ানো—তার চাইতে স্বাধীনচেতা অশ্রু অনেক ভালো।

অনেক কিছু পেয়েছি এক জীবনে, দু কুড়ি বয়সে, অনেক কিছু পাইওনি। তবে সব পাওয়ার মাঝে অনুপম পাওয়া, দুর্লভ, অন্যরকম পাওয়া 'তুমি'। তাই তুমি তোমার ঐ

সবুজ দীঘির মতো, আকাশের সীমানা-ছোঁয়া মনটা নিয়ে অনেক অনেক ভালো থাকো এ আমার একান্ত প্রার্থনা। তোমাকে বলি—

আমরা দুজনে এসো সন্ধি করি
তুমি দাও আমাকে নতুন জন্ম,
আমি দেই তোমাকে নতুনভাবে
কোকিলের কোমল গীতিকা!
(নষ্ট ডিমের খোলসের শব্দ—আবুল হাসান)

সেই গীতিকার রচনা বিচ্ছেদ ভিন্ন হবে না যে! বুঝি, অনুভব করি, তথাপি আমার চরণে শিকল। শেষ কথা বলি তোমার প্রিয় কবি মহাদেব সাহার ভাষায়—

একদিন কেঁদেছিলে, একদিন অন্য কোনো কথা বলো নাই
আমার সম্মুখে তুমি ঈষৎ দক্ষিণে ফিরে নিঃশব্দে শুধু কেঁদেছিলে!
আমি তাই কোনো কোনো বর্ষণের ভারাক্রান্ত রাতে
বুকের ভিতর কোনোখানে এক ব্যথা বোধ করি
মনে হয়, আমার অস্তিত্ব বুঝি লুপ্ত হবে মেঘে, মেঘের ধারায়
আমি কেঁপে উঠি, কেঁদে উঠি!

সব সামলে সমুখে চলার মানসিক শক্তি তোমার সহায় হোক। এলাম।

আংটি

মেঘ...সে সামান্য ইশরাতের মনে প্রথম থেকেই ছিল। কখনো গাঢ়, কখনো ফিকে এমন ব্যালেন্সিংয়ের মাঝেই পথচলা। 'ও' শুধু ভবিষ্যৎ ভেবে বর্তমানকে ব্যথিত করতে চায়নি। তাই হিসাবনিকাশ টেংরাটিলার গ্যাসক্ষেত্রে জমা রেখে, ঝাঁপ। মেয়েটার কি মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস? নাকি নিজেকে ঢাকতে তার এই উচ্চিংড়ে চলন? কে জানে! কোথায় গিয়ে যেন গভীরতাটা ঠিক ধরা পড়ে যায়। তার তখনকার অস্বস্তি দেখবার মতো! হাহ্, হাহ্...। সার্কাসের সঙ বাস্তব জীবন সামনে চলে এলে যে অনুভূতি নিয়ে চলে, তার চোখেমুখে সেই অভিব্যক্তি। 'ওর' ঐ জিপসি ব্যাগে কী থাকে? রাতের একাকিত্ব, নাকি শেষ সন্ধ্যায় মনের সুখে একা দেখা রংধনুর সিকি ভাগ? ইশরাতের মনের মেঘে যেদিন রং লাগলো সেদিনটা, সে-ই-দি-ন-টা...মিষ্টি রসে ডুবুডুবু, অভিনন্দনের তোড়ে মোবাইল ফেনিল বিয়ারের গ্লাসের মতো উছলানো। অথচ মেয়েটার মুখে কোনো আনন্দের তারাবাজি ছিল না। কুণ্ঠিত বাড়ানো হাতে ঝকমকে হীরের আংটি তেমন দীপ্তি আর আনতে পারলো কই! অমন দ্বিধাগ্রস্ত ইশরাতের কী হয়েছিল?

- **ইশরাতের যা স্বাভাবিকভাবে হবার কথা**

আমি ইশরাত রানা। দোনোমোনো হলে তাই। সেভাবেই লাইফ পার্টনারকে স্থায়িত্বে রূপ দেবার জন্যে...বাগদান বললে সেটাই সই, আংটি পরেছি। ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, গতকাল-আগামী কিছুই জানি না। আমি কেবল জানি এভাবেই চলে আসছে জীবনচক্র। জন্ম; পরিবারের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজেকে ইঁদুর দৌড়ে যুতে দেবার প্রস্তুতি। নিজের প্রতি সম্মান থাকলে জীবিকা অর্জন এবং শেষ পর্যন্ত ইনানো-বিনানো বিভিন্ন যুক্তির আঘাতে কুপোকাত হয়ে সঙ্গী বাছা। ব্র্যাকেটে কথা থাকে বংশবৃদ্ধি, সেটাই সত্য। কিন্তু তাকে বিভিন্ন চিনির কোটিং দেয়া হয়—যেমন মানুষ একা থাকতে পারে না, বাচ্চা লাগবেই, একা মেয়েকে এ সমাজ...ইত্যাদি ইত্যাদি। কিছু শুনেছি, কিছু শুনিনি। যা হবে হোক, বিজনের ফ্যামিলি যখন আমাকে আগ্রহ করে নিতে চাইছে, দেন লেট'স টেক আ চান্স। প্রথম প্রথম আংটিটা বেশ ভারীই লাগতো। নিজের অস্বস্তির কথা কাউকে বলতে পারছিলাম না। আমার নিরাভরণ দেহে স্থায়িত্ব পাওয়া অলঙ্কার। আত্মসত্তা হারাবার অথবা পাল্টানোর ভয় পলে পলে। ক্ষয়ে যাওয়া শুরু বাঁধের, মননের অজান্তেই। মেনে চলি, মেনে যাই। অভ্যাসের চর্চা চলে প্রতিদিন। এভাবেই যাপিত হয়েছে নারী-আয়ু—মার, খালার, তাদের মার...আমারও হবে। হতেই হবে। এটাই দস্তুর। যতো পশ্ হোক কর্মক্ষেত্র, ধার হোক কলম, আমি বউ হবার আগেই শাশুড়িকে

তুষ্টির একান্ন ফিকির টিপ্‌স হিসেবে পেয়ে যাই। হবু বরও আমি বউ আংটি পরানোর পর থেকেই মনে করিয়ে দেয় ক্ষণে ক্ষণে। আঙ্গুল মানে না, সে প্রায়শ আংটি খুলে রেখে দেয় যত্রতত্র, যেমন ভুলে যায় হবু বরের চেহারাটাও। পূবের বাতাস যখন আমাকে জড়ায় তখন, হায়! তখন কি কোনো পুরুষের স্পর্শ শোভা পায়? এক আকাশ তারার নিচে যখন আমার আমি ভাষা রহিত তখন ফোনের ও-প্রান্তে যে কারো স্বর বড় অনাকাঙ্ক্ষিত।

আমি ইশরাত রানা মেপে মেপে বিয়ে নামক আয়োজনের সব বৈতরণী পার হয়ে মধুচন্দ্রিমায়ও চলে যাবো—পূবালী বাতাস, তারা, একার বিষণ্ন বৈভব সব পেছনে ফেলে। যে কোনো পরিচয় ছাপিয়ে আমার ব্যক্তিগত জীবনই মানুষের কাছে সবচাইতে কৌতূহলের, মূল্যবান। কিন্তু ইশরাত রানা স্বপ্ন দেখেছিল বিজনের বন্ধুত্বের, কবুল বলা স্বামীত্বের নয়। বিজন, ইশরাতের বন্ধু কি কখনো হবে? বিজনরা বন্ধু হয়? তাদের ভালোবাসার প্রাবল্যই নাকি তাদের ঈর্ষান্বিত দানবে পরিণত করে। কতো শঙ্কা... কতো ভাবনা...স্বপ্ন। তবু লালচেলি, তবু কবুল, তবু হলুদের আসরে কোমরভাঙ্গা বসা, তবু মুহুর্মুহু ভিডিওর লাইট আর ক্যামেরার ফ্ল্যাশের অধিকারভুক্ত আগ্রাসন।

- **বিজনে, নিজের সনে**

শাহ্ নেওয়াজ—নামটাই কেমন জানি ভেজা কম্বলের মতো। তার চেয়ে বিজন নামটা অনেক বেশি স্মার্ট। যদিও একটু না, বেশ মালু মালু গন্ধ আছে ডাকনামটাতে, আমার ভালো লাগে। ইশরাতকে তিনদিনের অদেখায় ছেড়ে এসেছি। গ্রামে আসা, এক আত্মীয় মারা যাওয়াতে। ইশরাত আমার হবু স্ত্রী। যাকে আমি তাড়াহুড়োয় বলে আসতে পারিনি আমার দেখা সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর নারী সে, যাকে আমি সেইরকম যত্ন করতে পারিনি যেমন যতন ঝিনুক মুক্তোকে করে। শহরে ফিরলেই আমাদের যূথবদ্ধ জীবনের আনুষ্ঠানিকতা, এই লঞ্চটা ছাড়লেই আমি ইশরাতের জানালার পাশে পাহারাদার হাসনাহেনার ডাল হবো। সে কী, আকাশে মেঘ কেন? মেঘের চারপাশে বলয়, চাঁদের আলোর, যেন বা ইশরাতকে পরানো আমার অথবা আমাকে পরানো ইশরাতের আংটি, এমনই আলোর বলয়! রিংস অফ দ্য লাভ এন্ড ফিউচার...

- **ইশরাতের/ বিজনের যা হয়েছিল**

মেয়েটা বেশি আত্মবিশ্বাসী ছিল বলতেই হবে। চূড়ান্ত দিনের আগেও তার আশা ছিল ঐ দোলাচলে পরা আংটিটা খুলে একদিন সে ছুঁড়ে দেবে ঈশ্বরের দিকে, নারীজন্ম প্রত্যাখ্যান করে, মনুষ্য সত্তাকে স্বাগতম জানিয়ে।

ছেলেটা ভালোবাসতে পেরে ভীষণ সুখী ছিল। সে সুখ আকাশের গায়ে দেখতে গিয়ে লঞ্চের ছাদে ছিল গভীর রাতে।

তারপর দমকা হাওয়া, লঞ্চের জিগজ্যাগ...মেয়েটাও সে রাতে নিজের বাসার ছাদে, অস্বস্তির আংটি খুলছিল আর পরছিল, ছাদের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে। আংটিটা হাত ফস্‌কে...

ততোক্ষণে জলের উপর একটা উজ্জ্বল তারা ছুটে পড়েছে, তারার গায়ে বাতাসের ঝাপ্টা...

কাল ও ভূপাল

সাধারণ বর্তমান কাল:

'মালুর বাচ্চারে সাইজ করা লাগবো, ধর্ তো শালারে মাইনকা চিপা দিয়া'—কথা কটা শেষ করে আয়াত আলী মুন্সী অকারণেই হাঁপায়। যতোবার ভূপাল নামের এই ছেলেটাকে দেখে ততোবার আয়াতের ওর মায়ের কথা মনে পড়ে। ইশ্, কী জব্বর চেকনাই ছিল ঐ হিন্দু বেটির! উর্বশী-মেনকা-হুর কি লাগতো মাইয়াডার পাশে! ছেলেটাও হইছে পুরাপুরি মায়ের নাকমুখ বসানো। কতোবার কতো কিছু করলো আয়াত আলী, তবু যদি ছাওয়ালডা দেশ ছাড়ে! আরে বাপ, তোর জন্য বর্ডারের ঐ পার, তুই সেখানে গিয়ে দুর্গা কী লক্ষ্মীপূজা কর্, কেউ কিছু বলবে না। এখানে তুই চোখের সামনে থাকলে আয়াত আলী কি স্থির থাকতে পারে! ভূপালের ভিটাটুকু আয়াত আলীর বিশাল সম্পত্তির মাঝে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বাগড়া দিয়ে বসে আছে।

ভূপাল আয়াতের উচ্চারিত বাক্যগুলো শুনেও না শোনার ভান করে জোরে পা চালিয়ে পথটুকু পার হয়ে যায়। নিজের অক্ষমতা ঢাকার এর চাইতে সহজ উপায় তো ওর আর জানা নেই। অক্ষম! কে যে কী তা আজও ভূপাল ঠিকভাবে ঠাহর করতে পারলো না। মাঝে মাঝেই তাবৎ পুরুষদের ওর নপুংসক মনে হয়, নারীদের দেখলে এমন বোধ জাগে যে প্রত্যেকে নষ্ট গর্ভ নিয়ে হাঁটছে। পরক্ষণেই নিজের মায়ের চিন্তা মাথায় এলেই ভূপাল নারীদের প্রতি এমন মনোভাব পোষণের কারণে নিজেকে তিরস্কৃত করে। ভূপালের রক্তে ইদানীং খুব কমই দামামা বাজে। শুধু জুন মাসটা এলেই কী এক আক্ষেপে ওর পঁয়ত্রিশ পেরোনো শরীরটা আছাড়ি-বিছাড়ি করে ওঠে। ও তখন পিরোজপুর শহরের পথে পথে হাঁটে আর মুঠো মুঠো মাটি তুলে বাতাসে ওড়ায়। মাটিতে ভূপাল অনুভব করে ওর অদেখা মায়ের রক্তস্রোত।

নিত্যবৃত্ত বর্তমানকাল:

'আব্বা, আপনি ভূপাল স্যারের সাথে এমন করেন ক্যান? উনি আপনার কী ক্ষতি করছে?'

আয়াত আলীর তৃতীয় বিবির একমাত্র কন্যা কুলসুম তার কৈশোরিক সারল্যে বাবার গোপন ডেরায় ঠোনা মারে।

'খবরদার, ঐ ব্যাটার নাম মুখে আনবি না। গ্রামে ওর যন্ত্রণায় একটা কাজ করতে পারি না। বেবুশ্যের ব্যাটা, গত ইলেকশনে আমার বিরুদ্ধে ক্যাম্পেইন করলো। আরে ব্যাটা, তোর মা পাক আর্মির সাথে ঢলানি করা মাগি, তোর কিসের এতো রোয়াবি রে!'

কুলসুম বাবার ভাষার ধারে আড়ালে সরে দাঁড়ায়। ও মনে মনে ভেবে নেয় সুযোগ মতো ভূপাল স্যারকেই জিজ্ঞাসা করবে আসল ঘটনা কী।

'কুলসুম, তুমি এই ভর সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে কেন?'

'স্যার, আপনাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার ছিল।'

'তুমি বোঝো না ভূপাল দত্তের কাছে আয়াত আলীর মেয়ের কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে না!'

'কেন থাকতে নেই সেটাই আমি জানতে চাই।'

ভূপাল কুলসুমকে বলে 'কেন'র উত্তর।

ঐতিহাসিক বর্তমানকাল:

ভাগীরথী দেবী মাত্র আঠার বছর বয়সে বিধবা হোন। বিয়ের এক বছরের মাথায় স্বামী বিয়োগে স্তব্ধ ভাগীরথী শিশুপুত্রসহ ফিরে আসেন পিত্রালয়ে, পিরোজপুর থানার বাঘমারা কদমতলী গ্রামে। মেনে নেন সুকঠিন বৈধব্য। এভাবে যাপিত নিস্তরঙ্গ জীবনে একদিন আসে অদ্ভুত আঁধার। একাত্তর সাল। মে মাসের এক বিকেলে ইয়াহিয়ার ঝটিকা বাহিনী চড়াও হয় ভাগীরথীদের গ্রামে। নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের মাঝেও ভাগীরথীকে ওরা মারতে পারলো না। তার দেহলাবণ্য দস্যুদের মনে যে লালসা জাগালো তাতেই হার মানলো তাদের রক্তপিপাসা। পাক আর্মিরা তাকে ক্যাম্পে নিয়ে গেলো, চালালো দিনের পর দিন অত্যাচার। পরিস্থিতি যখন এমনই বিরূপ তখন ভাগীরথী মৃত্যুকে বড় আপন ভাবতে থাকলো। এক সময় এলো নতুন চিন্তা—ভাগীরথীর মনে হলো মৃত্যুই যদি বরণ করবে তবে কেন সাথে পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে মরবে না! যেমন ভাবা তেমন কাজ। ভাগীরথী কৌশলের আশ্রয় নিল। আর্মির লোকদের সে দস্তুরমতো খুশি করতে থাকলো। অল্প দিনেই সে অর্জন করে নিল নারী লোলুপ ইয়াহিয়া বাহিনীর আস্থা। পাক আর্মিদের কাছ থেকে ভাগীরথী জেনে নিতে থাকলো সব গোপন তথ্য। এক পর্যায়ে বিশ্বাসভাজন ভাগীরথীকে পাক আর্মি বাড়িতেও যেতে দিল। সামরিক ক্যাম্পে যাওয়া আর নিজ গ্রামে ফিরে আসার কাজ করতে থাকলো ভাগীরথী চরম নিষ্ঠার সাথে। এরই মধ্যে ভাগীরথী তার কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলো। গোপনে মুক্তিবাহিনীর সাথে গড়ে তুললো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।

এরপরই এলো আসল সুযোগ। জুন মাসের একদিন ভাগীরথী পাকসেনাদের আমন্ত্রণ করলো নিজ গ্রামে। এদিকে মুক্তিবাহিনীকেও তৈরি রাখা হলো যথারীতি। ৪৫ জন খানসেনা এলো ভাগীরথীদের গ্রামে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মুখে মাত্র চার-পাঁচ জন প্রাণ নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যেতে পারলো। ভাগীরথীর এরপর আর ক্যাম্পে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। পাকসেনারা ভাগীরথীকে ধরিয়ে দেবার জন্য

পুরস্কার ঘোষণা করলো—এক হাজার টাকা। খানসেনাদের কারো হাতে নয়, ভাগীরথী ধরা পড়লো নিজ গ্রামের রাজাকারদের হাতে। তারা তাকে তুলে দিল পাক আর্মির হেফাজতে।

পিরোজপুর সামরিক ক্যাম্প। দ্রৌপদীর মতো ভাগীরথীর বস্ত্রহরণ করলো পাক আর্মি স্থানীয় রাজাকারদের সহায়তায়, পিরোজপুর শহরের জনবহুল চৌমাথায়, হাটবারে। দু গাছি দড়ি দু পায়ে বেঁধে জ্যান্ত ভাগীরথীকে জান্তব জিপের পেছনে জুতে দেয়া হলো। যে ভাগীরথী নিজ গ্রামের বাইরে কখনোই তেমনভাবে শহর দেখেনি, সে পিরোজপুর শহরের প্রতিটি ধূলিকণা নিজের অঙ্গে মাখলো জিপের পেছনে বাঁধা অবস্থায়। শেষ হয় না মহোৎসব! এরপরও প্রাণ থাকে। নতুন পরিকল্পনা—দু পা দুটি জিপের সাথে, জিপ দুটো চলে যায় বিপরীত দিকে। নদীর নামে যে নারীর নাম সে হয়ে যায় ভাগের মানুষ, তার দ্বিখণ্ডিত দেহের সৎকারও হয় না। কুকুর-বিড়াল আর ধুলো সাক্ষী থাকে এই সাহসী জননীর বীর-গাথার।
(মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ৯ম খণ্ড, পৃ:৪২৪)

ঘটমান বর্তমানকাল

ভূপাল কুলসুমকে পুরো ঘটনা বলে দম নেয়।

'আয়াত আলী সেই লোক যে আমার মাকে ধরিয়ে দিয়েছে। এরপরও তুমি আমার কাছে আর কী শুনতে চাও কুলসুম?'

কুলসুম কোনো কথা না বলে নিঃশব্দে রাতের আঁধারে পিতার অপকর্ম ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে থাকে। অন্ধকারটা আরও গাঢ় লাগে কুলসুমের কাছে, যখন সে পথিমধ্যে আয়াত আলীর খাস চামচা বিহারী মুনিমকে দেখতে পায়। ওর মন কু গেয়ে ওঠে, এই লোক বাবাকে না বলে থাকবেই না। 'যা হয় হোক' ভাব করে কুলসুম পথটুকু পার হয়ে যায়।

ভূপাল নিজের মনেই তার অস্বস্তি পুষে রাখে। ওর কেন যেন বারবার মনে হতে থাকে কুলসুম কাজটা ভালো করেনি, ভূপালের বাড়িতে কুলসুমের আসা একদম উচিত হয়নি।

এই অংশটা ঘটমান বর্তমান অথবা পুরাঘটিত বর্তমান যে কোনো ভাবে বর্ণিত হতে পারে

জুম্মাবারে এমনিতেই লোক বেশি হয়। যে সারা সপ্তাহে পশ্চিম দিকে আছাড় পর্যন্ত খায় না সেও টুপিটা, পাঞ্জাবিটা বের করে মসজিদের দিকে হাঁটা দেয়। ভূপালদের গ্রামের মসজিদের সামনেটা জুম্মা শেষে লোকে লোকারণ্য। বিচার হবে। আয়াত আলী মেম্বারের ছোট মেয়ে কুলসুমকে এক মালুর ব্যাটা নষ্ট করেছে। আয়াত আলী জমায়েতের মাঝখানে বসা। সে অঝোর ধারায় কাঁদছে।

'আমার ফুলের মতো মেয়েটারে এই লোক কিনা করছে! ও হো হো'...আয়াত আলীর বিলাপ বাড়তে থাকে। 'মেয়ে আমার এমনই নিষ্পাপ যে লজ্জা থেকে বাঁচতে, নিজের স্যারকে বাঁচাতে আজকে সকালে বিষ খেয়েছে। আপনারা সবাই আমার মেয়েটার হায়াতের জন্যে দোয়া করেন। ওরে সদর হাসপাতালে ভর্তি করছি।'

সবাই আয়াত আলীর সাথে কুলসুমের জন্য মোনাজাত ধরে।

মুনিম রাজসাক্ষী ভূপালের অপকর্মের। সে কান্না-ক্ষোভ ইত্যাদি মিশিয়ে বয়ান করে কিভাবে ছেঁড়া কাপড়ে কুলসুমকে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যেতে দেখেছে।

সালিশে সাব্যস্ত হয় ভূপালকে ন্যাংটা করে হুন্ডার পেছনে বসিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হবে। ঘোরনা শেষে তাকে অবশ্যই মুসলমানি করানো হবে। পরে থানায় তার নামে ধর্ষণের মামলা করে আইনের হাতে সোপর্দ করা হবে।

ভূপালকে শক্ত করে ধরে আয়াত আলীর বড় ছেলে। ছোট ছেলে অত্যন্ত যত্নের সাথে ভূপালকে বস্ত্রের অহেতুক কারাগার থেকে মুক্ত করে।

'দেখো মিয়ারা, এই মুসলমানি ছাড়া দামড়ারে ভালো কইরা দেখো।'

শব্দ কটা কেমন যেন দূরাগত লঞ্চের ভোঁ-এর মতো লাগে ভূপালের কাছে। ভূপালের সামনে সব মিথ্যে হয়ে যায়, সে নিরাবরণ এক নারীকে নিজের মাঝে অনুভব করে। কান্না পায় না। চোখের সামনে ভাসে কুলসুমের চিরকুট—'যে বাপ নিজের মেয়ের নামে মিথ্যা কুৎসা রটাতে পিছপা হয় না আপন স্বার্থ রক্ষায়, সে আপনার প্রতি না জানি কতোটা ভয়ংকর হবে! স্যার, আপনি আজই পালান, আমাকে ক্ষমা করবেন পারলে।'

হোন্ডা স্টার্ট নেয়। ভূপালের মুঠোতে মাটি। ও অপেক্ষা করে ভাগীরথী নাম্নী এক নারীর সঙ্গী হবার জন্য। মা-ছেলে দুজনেই উলঙ্গ—এটা ভেবে ভূপালের কেমন যেন একটু লাগেও। হোন্ডার গতি বাড়তে থাকে, ভূপাল নিজে খণ্ডিত হয়ে এদেশের মানুষকে একত্রিত করে স্বাধীনতা এনেছিল যে নারী, তার নামে একবার জয়ধ্বনি দিয়ে আমি আবার আসবো ভেবে নিজেকে সঁপে দেয় ন-অনুভবের কোলে। ততোক্ষণে সদর হাসপাতালে কান্নার রোল উঠেছে, মাগরিব-সন্ধ্যা আহ্নিকের প্রান্ত ছুঁয়ে।

প্রাপ্তি

চুল ছিঁড়তে পারলে একটু ভালো লাগতো। কিন্তু অফিসে সবার সামনে সেটা সম্ভব না। বাথরুমে গিয়ে কি কাজটা করে আসবো? কোনোভাবেই নিজের এই ক্যালাসনেস মেনে নিতে পারছি না। আমি শৌণক কিভাবে শেভ না করে এলাম? আর আজকেই 'সে' এলো তেরদিন পর। হাত দুটোকে কোথায় রাখবো ভেবে পাচ্ছি না। আমি শিওর আমার খোঁচা খোঁচা দাঁড়িগুলোও লাল হয়ে গিয়েছে আনন্দে-লজ্জায়। সাদা মুলোর মতো ভ্যাবলা ফরসা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি 'তার' সামনে, বসের ঘাড়ের ওপর সিগনেচারের অপেক্ষায়। 'তার' দিকে তাকানোর আঠার আনা ইচ্ছে, অথচ জোর করে তাকিয়ে আছি সিসি টিভির মনিটরে, যেন বা অফিসে কে ঢুকলো-বের হলো তার হিসেব আমাকে দিতে হবে!

'ঠিক আছে শৌণক, তুমি আসতে পারো।'

বসের কথায় হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। আমি আসলেই আর পারছিলাম না।

'কী খবর, শরীর খারাপ নাকি?'

'জ্বি ম্যাডাম, খবর ভালো। আপনি কেমন আছেন?'

এটুকু বলতেই আমার ভাষা শেষ। কথা বলা ভুলে গেছি—যে কেউ অনায়াসে এই মুহূর্তে আমার সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত টানতে পারে।

'তোমার শরীর এমন ভেঙ্গে যাচ্ছে কেন?'

'এই তো ম্যাডাম, ভীষণ কাজের চাপ, তাই...'

'যত্ন নাও।'

বলতে পারি না 'আপনার জন্য', বলতে পারি না 'শরীর জাহান্নামে যাক, আপনি আবার কবে আসবেন?'

'তুমি কখন বেরোবে?'

'সাড়ে পাঁচটায়।'

'ঠিক আছে, আমি আগের জায়গায় থাকবো।'

স্রেফ অসহ্য সবকিছু। রিপার ফোন। আমার হবু স্ত্রী। ডানাকাটা পরী। সম্ভবত ভালোও বাসি। 'সম্ভবত' বলছি এই কারণে মিথিলা ম্যাডামকে দেখলে আমার যে বোধ কাজ করে, রিপার জন্য তার কোনোটাই আমি গত এক বছরে অনুভব করিনি। এই যে সামনে ঈদ, এখনো রিপার জন্য কিছুই কেনা হয়নি। অথচ মিথিলার জন্য কেনা জিনিসে আমার আলমারি ভেঙ্গে পড়ছে। সাহস করে দিতে পারিনি, এই যা। দেবো কিভাবে, আমাদের কোম্পানির মোস্ট ভ্যালুড ক্লায়েন্ট, তার ওপর যাকে বলে স্টার, মিডিয়া জগতে। জানাজানি হলে চাকরিই আর থাকবে না। আমাকে হাই-হ্যালোর পর্যায় পার হয়ে শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করেছেন, এই তো আমার সাত পুরুষের ভাগ্যি!

আমি কি অসুস্থ? হলেও হতে পারি। তবে এই অসুখটা আমার সত্যিই ভালো লাগছে। রিপা, অফিস, টিভি, ক্রিকেট, বাসা, বাবা-মা—এই চক্রের বাইরে একটা একান্ত স্বপ্নের জগৎ। চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই এলিজেবল ব্যাচেলর, যার জন্য যে কোনো মুহূর্তে যে কারো জন্ম তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে, তাকে নিয়ে আমি শৌণক দু পয়সার আধুনিক কেরানি স্বপ্ন দেখার সাহস পেয়েছি—এই তো অনেক।

'হ্যালো, মিথিলা ম্যাডাম আছেন?'

'জ্বি বলছি। কে বলছিলেন প্লিজ?'

'ভক্ত।'

কথা চলতে থাকে। তারা ওঠে, ভোর আসে। ম্যাডামজির মুড অনুযায়ী কখনো কখনো শব্দতরী ভেসে চলে বাধাবিহীন।

নিজের নাম ভুলে যাবার মতো ঘোরে দিন কাটে 'ভক্ত' সম্বোধনের আড়ালে। বাসায় মাকে একদিন বেভুলে বলেই ফেলি 'ভক্ত' আজকে চিকেন ফ্রাই খাবে উইথ চাউমিন। মা জিজ্ঞাসা করেন, 'ভক্ত কে রে?' লজ্জা পাই।

'তুমি এতো ব্যস্ত কেন? এক সপ্তাহ দেখা হয় না। ফোনেও তোমার হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া কোনো কথা নেই। মোবাইলেও অনীহা। আগামী মাসে বিয়ে আর তুমি এখনো কোনো কেনাকাটাই শেষ করলে না।'

'করে ফেলবো, রিপা। চিন্তা করো না।'

এনগেজমেন্ট রিংটা ছুঁড়ে ফেলতে পারতাম যদি! মাঝে মাঝে এমন ভয়ংকর ভাবনাও মনে আসে।

'আজকে আমার সাতাশতম জন্মদিন। Say, Happy Birthday to me.'

'Happy Birthday to you, dear.'

ঠিক সাতদিন পর আমার বিয়ে। আমি এখনো মিথিলাদিকে দেখলে হার্টবিট মিস করি। উনি জানেন না ওনার সেই ভক্ত এই আমি ছাড়া আর কেউ না। আচ্ছা, ওনাকে কি একটা কার্ড দেবো আমার বিয়ের? দেই। এলে এলেন, না এলে আর কী...

'ম্যাডাম, আমার শুভকাজ। এলে ভী-ষ-ণ খুশি হবো।'

ওয়েডিং রিসেপশন, ২৪শে ফাল্গুন। দূর থেকে পাঁচ ফুট পাঁচের এক নারীমূর্তি আসছে, চোখ পেতে দেখতে থাকি। এই তো স্টেজের কাছে। আমি লোডশেডিং পেরিয়ে ঝাড়বাতির মতো জ্বলে উঠি।

'কী সুন্দর বৌ তোমার শৌণক! সুখী হও ভাই।'

'আপনার পাশে কিস্‌সু না' বলতে পারি না। আমার হাতে 'তার' দেয়া উপহারের ছোট্ট খাম। উপরে লেখা 'শৌণকের নবজীবনে আশীর্বাদ—একমাত্র বড়বোন মিথিলা, ভাইকে, ভক্তকে নয়।'

আমার আকাশে জমা বিভ্রান্তির মেঘ দূর হয়। বাবা-মার একমাত্র সন্তান আমি কোনো যোগ্যতা ছাড়াই পেয়ে যাই দুর্লভ বোন। একেই বলে মঙ্গলের গ্রহণ, রিপাকে জড়াই বাসরীয় আশ্লেষে ক্লিন শেভড মুখে, উইদাউট মিসিং এনি হার্টবিট...ভালোবাসা

থেকে যায়, বদলে যায় সময়ের প্রয়োজনে সম্বোধনের সুর, সেখানে বেজে যায় স্বাভাবিক সম্পর্কের আরোপিত রিড...

স্মৃতি হয়ে রবে

মার্কেটটা এখনো ভালোভাবে চালু হয়নি। কাজ চলার মতো। আমাদের এলাকায় তেমনভাবে ফাস্টফুডের দোকান না থাকাতে ডেটিং পারপাসে এদিকে আসতেই হয়। আর এটাই তো সময় যত্রতত্র ঘোরাফেরার। এসএসসির পর সামান্য অবসর। নাইনটিন নাইনটি ফোর, এসো করি প্রেমেতে স্কোর শব্দ ক'টা বলে আমি তারিকের হাতে চাপড় দেই।

আমার না হয় এসএসসির পর ফুরফুরে মেজাজ, তারিকের যে এইচএসসি এবং সে যে তার মোটা মাথায় কোনো লেখাপড়াই করছে না, সে তো আর আমার মনে নেই। তারিকজাদা সসম্মানে এইচএসসিতে ডাব্বা মারলেন। আমি এমসিকিউ-এর কল্যাণে আটশোর উপর নম্বর নিয়ে পাশ করে স্বাভাবিক নিয়মে কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম নাইনটি ফোরে। আমার হবু জামাই কাম চলমান প্রেমিক ইন্টার ফেল করে হার্টফেল করানোর ব্যবস্থা করলেন।

'এবার যদি পাশ করতে না পারো ভালোভাবে তোমাকে আমি তালাক দিব, বুঝছো তো?' অক্সিডাইজড গহনা কিনতে কিনতে তারিকের কানে ফুসমন্তর দিলাম। ঘষটে মষটে তারিক সেকেন্ড ডিভিশনে ইন্টার উতরোলেন। আমার আর প্রথম প্রেমকে তালাক দেয়া লাগলো না।

মানুষ আসলে লেখাপড়া কেন করে? শিক্ষিত হবার জন্যে। যত্তসব বোগাস কথা। বাংলাদেশের পোলাপান লেখাপড়া করে ভালো চাকরি বাগানোর জন্যে। ম্যাক্সিমাম মেয়েরা এদেশের উচ্চশিক্ষিত হয় বিয়ের বাজারে ভালো দরে বিকোবার জন্যে। মোটামুটি আটশোর কাছাকাছি নম্বর নিয়ে আমি এইচএসসিও পাশ করে ফেললাম। আটশো নম্বর কোনো কাজেই লাগলো না। ঢাকার মাইয়া ঢাকায় পড়ার সুযোগ পেলাম না। পাততাড়ি গুটিয়ে ঢাকার বাইরের ভার্সিটিতে যুতে গেলাম। সাবজেক্টটা ইন্টারেস্টিং প্লাস খুবই রেয়ার ও হেভি প্রোসপেকটিভ। পড়তে আমার বরাবরই ভালো লাগে। বিশেষ করে সায়েন্স। আই রিয়েলি লাভ ইট।

আচ্ছা, এই যে রক্তের বাইরের একটা সম্পর্ক, প্রেমিক বলি বা বর, এখানে কি প্রতিযোগিতার একটা ব্যাপার আছে? থাকতে পারে। আজকাল তারিকের কথাবার্তায় আগের সেই উষ্ণতা টের পাই না। ও যেন একটু বিরক্ত আমার ঢাকা ছাড়ার কারণে। আর সায়েন্সের ক্লাসে ফাঁকি দেবার স্কোপ নেই বললেই চলে। প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে করতে জান জেরবার। অতএব ফলাফল আমার ঘনঘন ঢাকা যাওয়াও সম্ভব হয় না। তারিকও তেমন আসতে পারে না। বাবা-মাকে তো বলা যায় না আমি আমার ডার্লিংকে দেখতে অমুক বিভাগে যাচ্ছি। লুকিয়ে মিথ্যা গল্প ফেঁদে আসতে হয়। তারিকের হাতে অখণ্ড অবসর ইন্টারের পরে কোথাও ভর্তি হতে না পেরে। ডিগ্রিতে ভর্তি হয়ে আছে। ওখানে ক্লাস করা না করা একই কথা। সেকেন্ড ক্লাস চেয়ার-টেবিলও

নাকি পায় তারিকের ভাষ্যমতে। আগে যেখানে প্রতিদিন দেখা হতো সেখানে সাক্ষাতের এমন ক্রমহ্রাসমান স্বাস্থ্যে তারিক যারপরনাই শংকিত। আমার কিন্তু কিছুই তেমন লাগে না। হ্যাঁ, আমি ওকে মিস করি। আমাদের সেই এলেবেলে ঘোরার সময়গুলোর কথা আমার ভীষণ মনে পড়ে। মাঝেমাঝে পড়ার চাপে হাসফাঁস লাগে। তারপর ভাবি, এসব তো আমাদের আগামীকে সমৃদ্ধ করতেই। এখনকার একটুখানি কষ্ট সামনের দিনগুলোকে মসৃণ করে তুলবে অনায়াসে।

দেখতে দেখতে আমার আর তারিকের প্রেম পাঁচ বছরে গড়ালো। দুই বাসাই একটু-আধটু জানে। উপদেশ বিতরণ করে। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তারিক। আর আমি বাসার বড় সন্তান। হতে পারি মেয়ে। কিন্তু আমার বাবা-মায়ের সেটা নিয়ে তেমন কোনো হায়-আফসোস নেই। লেখাপড়া করো, নিজের পায়ে দাঁড়াও। পছন্দ করছো কাউকে, সমস্যা নেই। দুজনেই এস্টাব্লিশ্‌ড হও, বিয়ে দিয়ে দেয়া যাবে। আমার প্যারেন্টস-এর দৃষ্টিভঙ্গি এমনই লিবারেল।

আমি কি ছাই জানি তারিকের মনে সন্দেহের হিমালয়, নিজের এমন ল্যাগবেগে পড়ালেখার ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক হীনমন্যতা! আমি কিছুই জানি না। পুরো ভার্সিটি জানে আমার বিয়ে ঠিকঠাক। ছেলে প্রায়ই আসে আমাকে দেখতে। ভার্সিটি লাইফে তাই আমার প্রচুর ভাই জুটলেও প্রেমিক একটাও জোটে না। পড়ি মনোযোগ দিয়ে। বাঁধাধরা ফার্স্টক্লাস পেয়ে যাচ্ছি। কারণ টিউটোরিয়াল, ক্লাস পারফরমেন্স সব মিলিয়ে টিচাররা জানতেনই আমি অবধারিতভাবে ফার্স্টক্লাস পাচ্ছি। সিনেমার নায়িকারা যেমন অনায়াসে প্রথম হয় সেরকম ব্যাপার না। জান লড়িয়ে পড়ে আমি রেজাল্টটা আদায় করে নেই। ফার্স্টইয়ারের রেজাল্টে আমার তো ধেইধেই করে নাচার ইচ্ছে জাগে। যেদিন রেজাল্ট হয় সেদিনই আমি রাতের গাড়িতে ঢাকা রওনা হই তারিককে সকালে সারপ্রাইজ দেবো ভেবে। নাহ্, তারিককে তেমন খুশি করতে পারলাম না। ফেরার পথে তারিক আমাকে খুব অনাড়ম্বরভাবে একটা ডায়মন্ডের রিং পরিয়ে দিল। গহনা আমার খুবই পছন্দ। আমি আনন্দে পরে নিলাম।

আহা, আংটিটা পরার পর থেকেই মনটা কেমন পাল্টে গেলো। এটা তো আমাদের আজন্মের লালিত সংস্কার। আমি আজ থেকে স্থায়ীভাবে কারো হয়ে গেলাম। ক্যাম্পাসে গর্বের সাথে হাত দোলাতে থাকলাম। আমার ছেলেমানুষিতে বান্ধবীরা যোগ দেয়। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার আঙ্গুল দেখে। আমিও রুনা লায়লার মতো কারণে অকারণে হাত নাড়ানাড়ি করি যেন আংটি সবার চোখে পড়ে। প্রাথমিক উত্তেজনা থিতিয়ে যেতেই মনে ভাবনা আসে, এই ব্যাপারটা পারিবারিকভাবে হলে আমার বাবা-মা কতোই না খুশি হতেন! মনটা কুঁকড়ে যায়। বাসায় জানাই না। আংটিটাও খুলে রাখি। পাছে আব্বা-আম্মা দেখে মনে কষ্ট পান!

চেয়ার-টেবিল পাশ করলেও তারিক বি.কম পাশ করতে পারলো না। খাওয়া, ঘুমানো, টিভি দেখা, এই রুটিনে তারিকের জীবন বেশ কিছুদিন চললো। কোলপোছা ছেলে বাবা-মার, কিছুই বলেন না তাঁরা। তেমন কোনো বন্ধুবান্ধবও নেই যে আড্ডা দেবে বা তাদের সাথে মিলেমিশে ব্যবসা করবে। বহু চেষ্টাচরিত্র করার পর দেখলাম তার বেশ কম্পিউটারের প্রতি ইন্টারেস্ট। বুঝিয়ে শুনিয়ে কম্পিউটারের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করালাম, মানে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে আমাকে একটু কম জ্বালাবে। পড়ালেখার এই ঘোরতর চাপে আজকাল ওর এসব ন্যাকামি আমার মাঝে সাঝে খুবই অসহ্য লাগে। সামাজিক অবস্থান নিয়ে তেমন মাথাব্যথা আমার কোনোকালেই ছিল না। তারিক কী করে—এই প্রশ্নের জবাবে যে আমার কিছুই বলার নেই সমাজে, ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে আনা দরকার, তা আমাকে কখনো তাড়া করে না। অথচ আমি নরমাল মানুষ হলে এই হিসেবটা মাথায় আসার কথা ছিল। ভালোবাসা আসলেই মানুষকে অন্ধ করে তা পেছন ফিরলে বুঝি।

অবশ্য এই একটা জিনিস বাদ দিলে তারিক তো সোনার টুকরো ছেলে। মায়ের এক সন্তান, কোনো ভাইবোন নেই। ঢাকায় বাড়ি। ছেলে নেশা ভাং করে না। বাজে কারো সাথে মেশে না। শুধু একটু অলস। এই তো! আমি এসব গুণের মাঝে ওর একটা দোষ মাফ করে দেই।

দিন যায় দিনের নিয়মে। আমি একসময় অনার্স পাশ করে ফেলি। আমাদের ভার্সিটিতে আমাদের সাবজেক্টটার মাস্টার্স নেই। অতএব এবার ঢাকা ফেরার পালা। পাঁচ বছরের ক্যাম্পাসকে বিদায় জানিয়ে, কেঁদে কাঁদিয়ে চলে এলাম আবার ঢাকায়। প্রাইভেট একটা ইউনিভার্সিটিতে আমার সাবজেক্টটার মাস্টার্স খুলেছে। আমি সেই ভার্সিটির কলেজ-সেকশনে লেকচারার হিসেবে পড়াতে শুরু করলাম আর ওদের ভার্সিটিতে মাস্টার্স করতে থাকলাম। কতোদিন পর আবার বাসার জীবন, আহ্! ভাইবোনেরা এই পাঁচ বছরে কতো অচেনা হয়ে গেছে। বড় হয়েছে। আমার অনুপস্থিতিতে রিংকু দেখি এখন বিল-টিল সবই দিতে পারে। আমার ভালো লাগে। প্রথম বেতন পেয়ে বাসার সবাইকে নিয়ে বাইরে খাই। কী যে আনন্দ হয়! বাবা বাসার বিভিন্ন ইস্যুতে আমার সাথে আলাপ করেন। এক ধরনের নির্বাসন থেকে ফিরেছি এমন মনে হতে থাকে। ক্যাম্পাস লাইফ খুব মনে পড়ে। আবার নতুন বন্ধুদের সাথে থাকতে থাকতে ওদের যেমন কম মনে পড়তে থাকে তেমনি ইদানীং তারিককেও খুব কমই ভীষণ কাঙ্ক্ষিত কেউ মনে হয়। তারিক আসলে আমার এখন অভ্যস্ততার অঙ্গ। সেই কৈশোরের স্পার্ক আর নেই।

তারিককে কংগ্রাচুলেট করি শেরাটন থেকে কেক নিয়ে ও ডিপ্লোমাটা শেষ করাতে। আমাদের এলাকায় এখন অনেক ফাস্টফুডের দোকান। শুধু বললেই হলো কখন কোথায়, ব্যস্ ডেটিং হয়ে যায় নিমেষে সেটিং। বাসায় দেখা করলেই বা কী! কোনো বাসা থেকেই আর তেমন কোনো আড় নেই। ঈদে চাঁদে দুই বাসার অভিভাবক মহলে শুভেচ্ছা বিনিময়ও চলে অনায়াসে। আমার ভাইবোনদের জন্যে উপহার আসে। আমার বাবা আমার বিয়েকে সামনে রেখে পাশের জমিতে আরেকটা চারতলা করার কাজে হাত দেন। মাস্টার্সটা কমপ্লিট করলেই বাজবে সানাই। এমনই ইচ্ছে আমার বাবার।

‘শোনো, আমি ফিনল্যান্ড যাবো। ওখানে কম্পিউটারের উপর হায়ার ডিপ্লোমা করবো। তারপর ফিরে এসে কম্পিউটার এক্সেসরিজের ব্যবসা করবো।’

'খুব ভালো কথা।' আমি তারিককে বলি।

'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী?'

'বাসায় বিয়ের কথা বলো।'

'আমি তোমাকে বিয়ে করে রেখে যেতে চাই আমার বাসায়। আমি না থাকলে আমার বাবা-মাকে কে দেখবে?'

তারিকের কথা মেনে নিয়ে আমি আমার বাসায় কথাটা বলি।

আমার বাবার চারতলা শেষ হবার আগেই, আমি মাস্টার্স কমপ্লিট করার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। একই এলাকায় আমি লালচেলি পরে আরেক বাসায় চলে যাই। আমাদের ন বছরের প্রেমের সফল পরিণতি ঘটে।

বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে তারিকের ফ্লাইট। কেমন ঘোর ঘোর একটা অবস্থা। প্রেম করা আর বিয়ে করা! বাব্বা, লাইট ইয়ার্সের পার্থক্য! তারিকদের বাসা ভর্তি মানুষ গিজ গিজ করে। বংশের বড় ছেলের বিয়ে বলে কথা! লতায়-পাতায়, ঘাসে, আগাছায় আত্মীয়রাও এসে হাজির। খারাপ লাগে না। তবে তারিকের সাথে একটু নিরিবিলিতে বসবো, রাত ছাড়া আদর বিনিময় হবার কোনো উপায় থাকে না। আনুষ্ঠানিকতা শেষে তারিক চলে যায়। আমি থেকে যাই তারিকের বাবা-মা অর্থাৎ আমার শ্বশুর-শাশুড়ির দেখাশোনা করার জন্যে। এটাই তো রেওয়াজ। স্বাভাবিকভাবেই সব মেনে নেই।

তারিকদের বাসায় আশ্রিতের সংখ্যা কেবল কম নয়। অমুক ফুপু, তমুক চাচার ছেলে মিলে চারজন। ধীরে ধীরে বুঝিয়ে আমি পড়াশোনা করার জন্যে একা রুমে থাকার পারমিশন নেই শাশুড়ির কাছ থেকে। বেশ অনেকদিন ফুপু শাশুড়ির সাথে আমাকে বাধ্যতামূলকভাবে শুতে হয়। আমি নাকি রাতে ভয় পাবো!

চাকরি, পড়া সব শেষ করে আমার বাসায় ফিরতে ফিরতে সাতটা বাজেই। ফেরার পথে প্রথমে পড়ে আমার বাবার বাসা, তারপর দশ মিনিটের দূরত্বে তারিকদের বাসা। প্রায় প্রতিদিনই আমি ফেরার সময় আম্মার সাথে দেখা করে আসি। সেজন্য সাতটার জায়গায় হয়তো আটটা বেজে যায় ঘরে ঢুকতে। বাহ্, এই তো মওকা। এ নিয়ে বেশ কথাবার্তা চালাচালি শুরু হলে আমি মায়ের বাসায় যাবার আচারে একটু লাগাম দেই। অশান্তি ভালো লাগে না। আমার সাবজেক্টে ফিল্ড ওয়ার্ক প্রচুর। কখনো কখনো ঢাকার বাইরে যাওয়া বাধ্যতামূলক। নাখোশ হন শ্বশুর-শাশুড়ি দুজনেই। ছেলেকে ফোনে জানান। আমি হেসেই উড়িয়ে দেই।

তারিককে একদিন ই-মেইলে বলি, 'তুমি আমাকে কোনো হাত খরচের টাকা দাও না কেন? ছয় হাজার টাকা বেতন পাই, সেটা দিয়ে তো আমার যাতায়াত এবং পড়ার খরচ চালানো খুবই মুশকিল।' উত্তর আসে—'তুমি কি জানতে না তুমি একজন বেকার ছেলের কাছে বিয়ে বসছো? বেশি প্রয়োজন হলে আব্বার কাছে চাও।'

আমি শ্বশুরের কাছে টাকা চাইতে পারি না। অতোটা সাবলীল সম্পর্ক আমার সাথে উনাদের গড়ে ওঠেনি। মাঝে মাঝে আমার আম্মা টাকা গুঁজে দেন হাতে। সেটা দিয়ে আমি কোনো রকমে আমার সংকট কাটাই। দাঁতে দাঁত চেপে থাকি, আমার মাস্টার্সটা শেষ করতে হবে যে কোনো প্রকারেই হোক।

তারিককে অতোশত আর বলি না। এতো দূরে থাকে, শুধু শুধু ওই বিদেশ-বিভূঁইয়ে ওকে টেনশনে ফেলে কাজ কী! আমি কি ছাই জানতাম এদিক থেকে সবই জানানো হচ্ছে! আমার রিডিং পার্টনারের নাম রায়হান। রাত হওয়াতে দু-একদিন বাসায় দিয়ে যায়। ব্যস্, ঐ খবরও ফিনল্যান্ড চলে যায়। আমি বাধ্য হয়ে টিচারকে বলে আরেক মেয়ে সহপাঠীকে রিডিং পার্টনার করে নেই। ওঁ শান্তি বলে কথা, কে চায় এসবে জড়াতে!

ছয়মাস পরে তারিক দেশে আসে। বন্ধে। সবার জন্যে মন পোড়াচ্ছে। দেড় মাসের ছুটি। এদিকে আমার সেমিস্টার ফাইনাল চলছে। আমি কিন্তু খুব খুশি হই। বিয়ের পর তো আমাদের কোথাও যাওয়া হয়নি। নিজেদেরকে একান্তে একদমই পাইনি। আমি হানিমুনে যাবার পরিকল্পনা করি। যাওয়া ঠিকঠাক, এর মাঝে একরাতে তারিক আমার সাথে ঝগড়া শুরু করে। বিষয় আমি যেন পড়া এবার ছাড়ি। ওদের তো অনেক আছে, আমি আর এতো পড়ে কী করবো? প্রথমে ঠাট্টা ভেবে আমি কর্ণপাত করি না। পরে দেখি, আরে, ব্যাপার তো সিরিয়াস! আমাকে নাকি বাচ্চা দিয়ে যাবার জন্যে ও এবার এসেছে। আমি মুখ ফস্‌কে বলে ফেলি, 'যদি বাচ্চা না নেই এখন? তুমি দিয়ে গেলেও যদি ফেলে দেই?' প্রত্যুত্তরে আমাকে মারতে গিয়ে তারিক ব্যালেন্স হারিয়ে পড়ে হাত ভেঙ্গে ফেলে।

দেড় মাস কাটে। তারিক ফিরে যায়। নরমে গরমে সম্পর্ক থাকে, চলার মতো। মাস্টার্স শেষ হয়। আমি বাইরের বিভিন্ন ভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে থাকি পিএইচডি করার জন্যে। রোমানিয়া থেকে অফার আসে। ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ প্লাস পড়ার সুযোগ। হাফ স্কলারশিপে পড়ার সুবর্ণ অফার। শ্বশুর বাড়িতে বলি। এক কথায় নাকচ। তাদের ছেলে অলরেডি বাইরে থাকে। ছেলের বউকেও বাইরে দিতে একা একা তাঁরা মোটেই রাজি নন। তারিকও পজিটিভ কোনো কথা বলে না। আমি মন খারাপ করি। তারপর মেনে নেই। এদিকে তারিক ফিনল্যান্ডে আন্ডার গ্রাজুয়েশনই পার করতে পারেনি। কবে যে দেশে ফিরতে পারবে আল্লাহই ভালো বলতে পারবেন। চাকরি ছাড়ি না।

ছয়মাস পর আবার জাপান থেকে অফার আসে। আমি এবার নড়েচড়ে বসি। আগের মতোই জানাই। না-সূচক জবাবও পেয়ে যাই। আমার বাবাকে তারিক ফোন করে বলে দেয়, আমার বাবা যদি আমার বাইরে যাবার কোনো প্রকার খরচ দেন কিংবা সহায়তা করেন, তাহলে ও আমার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখবে না। যেতে আমার মোটামুটি তিনলাখ টাকা লাগবে।

খুব কাছের এক বান্ধবীকে ফোন কের বলি, ও আমাকে টাকাটা ধার হিসেবে দিতে পারবে কিনা, কিংবা যোগাড় করে দেবার কোনো উপায় ওর আছে কিনা। সাতাশ বছরের একটা মেয়ে আমাকে কোথা থেকে দেবে এতো টাকা!

বান্ধবী টাকা দিতে না পারলেও একটা প্রশ্ন করে—'এই, তোর বিয়েতে গহনা কেমন পেয়েছিস রে?' 'চল্লিশ ভরির মতো।' 'ওগুলো কার কাছে?' 'বেশিরভাগই শাশুড়ির কাছে। আমার কাছে ভরি দশেক আছে হয়তো।' 'শোন্, কোনো একটা উপলক্ষ করে গহনা ঐ ভদ্রমহিলার কাছ থেকে নিয়ে নে।' আমি তক্কে তক্কে থাকি। এক বান্ধবীর বিয়েতে শাশুড়ির কাছ থেকে চেয়ে নেই কিছু গহনা। পরবো বলে। তারপর আর ফেরত দেই না।

হ্যাঁ, আমি গহনা বিক্রি করি। কিছু অল্পস্বল্প বন্ধুদের কাছ থেকে ধারও করি। গোপনে ডিভোর্স কেস ফাইল করি। কাউকে কিসসু না বলে ডিভোর্সের পেপার ডিএইচএল-এ কুরিয়ার করে তারিকের কাছে আমি জাপান চলে আসি।

জানাজনি হবার পরে অনেক উপদেশ শুনেছি। তারিক ফিনল্যান্ড থেকে জাপান এসে আমাকে অনেক কিছু বলে গেছে, ক্ষমা চেয়েছে। আমার মন গলেনি।

আমি ল্যাবে দুর্দান্ত কাজ করছি। স্মৃতিতে অনেক ঘটনা ভেসে আসে। ভালোমন্দ জানি না। আমি এই কাজটা করেছি। ন বছরের প্রেম, পাঁচ বছরের বিবাহিত সম্পর্ক সব পেছনে ফেলে আসার জন্যে যেসব কারণ ছিল তা কি যথেষ্ট? জানি না। আমি শুধু আমার মেধাকে বাঁচাতে চেয়েছি আত্মসম্মানসহ। বিয়েতে গহনা পাওয়া এবং তার হেফাজত করা খুব জরুরি আমি এটুকু শিক্ষা ভালোমতো পেয়েছি। কাজ শেষে বাসায় যখনই ফিরি আমার কারো কাছে কৈফিয়ত দিতে হয় না কেন দেরি হলো? যা করিনি (পরকীয়া) তার জন্যে গঞ্জনাও শুনতে হয় না। আমি ভালোই আছি। কোনো মনোমালিন্য ছাড়া আমি তারিককে একটা কথাই বলেছি, 'তুমি আমার খুব সুন্দর একটা সময়ের স্মৃতি হয়ে থাকবে।'

ত্রিকালে ডুবলো স্নেহের লোটা

তেড়িয়া রোদটা মাথার মধ্যে সরু গলির মতো ঢুকে পড়ছে। মফস্বলের কৃশ রাস্তাগুলো ঝাঁ দুপুরে কেমন যেন ঝিম্‌মারা থাকে। তেমনভাবেই হাঁফসানো গরম ঝিঁঝিঁ ধরাচ্ছে ইসাবেলার সর্বাঙ্গে। তবু ইসাবেলা মন্ত্রমুগ্ধের মতো হাঁটতে থাকে। রোদ ওর কাছে এক ধরনের নেশার মতো। মরিচের যেমন ক্যাটাগরি তেমনি এক এক সময়ের রোদ ওর কাছে একেক মাত্রার; কোনোটা কাঁচামরিচ, কোনোটা নাগা, আবার কোনোটা বোম্বাই। এ এক অদ্ভুত অনুভব! সদ্য কলেজ পেরোনো বয়সে ও যখন রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতো তখন যে কোনো তাপই ওর কাছে স্বাভাবিক, তা বৈশাখেই হোক কিংবা আশ্বিনে। গৌরবর্ণ পুড়ছে, ইসাবেলা হাঁটছে, কাঁধে শান্তিনিকেতনী ব্যাগ, একটা দিনের দুপুর আরেকটার গায়ে জড়ানো। চোখ বন্ধ করলেই ইসাবেলার কতো কথা যে মনে পড়ে...

পথ শিশু, পথ মা

টাকা নেই পকেটে। কোনোমতে বাসভাড়া। বাসে ফার্মগেট। সেখান থেকে টেম্পোতে মালিবাগ। তারপর হাঁটা, অতঃপর বেইলী রোড। এই রাস্তায় হাঁটতে ইসাবেলার খুব ভালো লাগে। সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, ভিকারুননিসা কলেজ, বিবিধ কোয়ার্টার, দু পাশ থেকে ঝাঁপানো গাছের ছায়া, ও পাশে রমনা, বইয়ের দোকান, জামদানি শাড়ির পসরা, মহিলা সমিতি মঞ্চ—এসব ছুঁয়ে ইসাবেলা প্রায়ই উল্টাপাল্টা হাঁটে। ওর জিন্‌সের হাঁটু অব্দি ধুলো, হ্রস্বস্বাস্থ্যে শুধু ত্বকের ঔজ্জ্বল্য—মানুষ ঘুরে ঘুরে তাকায়, ইসাবেলা ঘুরনা দিয়ে হাঁটে। গাইড হাউস পেরোলেই ডাস্টবিন। ডাস্টবিনের পাশে প্রায় দেখা যায় না এমন ফুটপাতে বছর সতেরোর একটা মেয়ে বসা। ইসাবেলা দু বার চক্করের পর খেয়াল করলো। তৃতীয়বারের মুহূর্তে ক্ষীণকণ্ঠ শোনে কী শোনে না- 'আফা, আমার বাচ্চাটারে কিছু দিয়া যান। কাইল রাইতে হইছে, আমি নড়তে পারতাছি না। একটু সাহায্য করেন।'

চমকে তাকায় ইসাবেলা ফুটপাতে নোংরা কাপড়ের উপর রাখা ততোধিক নোংরা পুটুলিটার দিকে। মনোযোগ দিয়ে তাকাতেই গোলাপি একটা মুখ দেখে ইসাবেলা কাপড়ের ফাঁকে, ঘুমন্ত। পাঞ্জাবির পকেট হাতড়ে পঞ্চাশ টাকার বেশি পায় না। তাই দেয় গোলাপির (ওর ভাবা তাৎক্ষণিক নাম) মাকে। তারপর বেইলী রোড থেকে হেঁটে মিরপুরের বাসায় ফেরা সন্ধ্যায়। ইসাবেলা পরের দিন পর্যাপ্ত (ঐ বয়সে তিন হাজার ওর কাছে অনেক টাকা) টাকা নিয়ে আবার ফেরত যায়। গোলাপির মাকে পায় না।

বৈধ, অবৈধ, বিকার...

বছর যাচ্ছে, আবহাওয়া পাল্টাচ্ছে। বৈরিতা সর্বত্র। অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে এসে সানস্ট্রোকের ভয়ও পেতে হচ্ছে। পরিবেশের উপর কৃত অত্যাচার ফিরে ফিরে আসছে মানবের দুয়ারে। তাই ষড়ঋতুর বাংলা দ্বি-ঋতু, গ্রীষ্ম-বর্ষায় বিভক্ত হবার যোগাড়। মানিয়ে নেয়ার খেলা চলে। নতুন আড্ডার জায়গা ইসাবেলাদের মধুমিতা সিনেমা হলের পাশে, এক সিনিয়র ফ্রেন্ডের বাসায়। ইসাবেলা মধুমিতা হলের পাশ দিয়ে লঘু পায়ে হাঁটতে থাকে। এখানে ঢুকলেই ন্যাড়া পাগলির দেখা মিলে। দেখেও না দেখার ভান করে এটুকু পথ পার হওয়া সবদিক থেকে শ্রেয়। প্রতিদিনই ওর আড্ডায় নিজেকে সঁপতে একটু সময় লাগে এই বৈরী অভিজ্ঞতার কারণে। টুকরো কথা, ছেলেদের তৈরি নিকোটিনের ধূম্রের ফাঁকফোকর গলে ন্যাড়া পাগলির কথাই ওর মনে থেকে থেকে ভেসে ওঠে। ময়লা ম্যাক্সি সদৃশ জামা, ন্যাড়া মাথা, মাত্রাতিরিক্ত উন্নত বুক, পোড়া ফরসা রংয়ে তামাটে ডিসটেম্পার, জামার পেছনে জমাট কালো রক্ত- ইসাবেলার মধ্যে এক ধরনের বুনো ক্রোধ জন্ম দেয়। কেন এ মহিলার পরিবার একে এই ভরা যৌবনে গৃহহীন করেছে? মানসিক স্থিতিহীন মানুষকে দেয়া যায় না সামান্য আশ্রয়! ইসাবেলা গোপনে চোখ মোছে। জাকিয়া ভাবীকে ত্বরিত বিদায় জানিয়ে উঠে পড়ে ঝোলা কাঁধে। বেশ কয়েক মাস আর ও-পথ মাড়ায় না। হয়তো ঐ দুঃসহ স্মৃতি এড়াতেই!

জাকিয়া ভাবীর ফোন—'একবার আয়। বারোয়ারি না, শুধু তোতে-আমাতে গল্প হবে। দুপুরে বাচ্চারা ইস্কুলে থাকবে, তোর ভাই অফিসে। ক্লাস কেটে আয়। নতুন তোলা কিছু ছবি দেখাবো।'

গলি দিয়ে ঢোকা যাচ্ছে না। রোদে গ্রিল হবার দশা। ইসাবেলা দেখার চেষ্টা করে এতো ভিড়ের কারণ—ন্যাড়া পাগলি ঢাকের মতো পেট নিয়ে ড্রেনে পাছা ঝুলিয়ে বসা, বড় কাজ করার ভঙ্গিতে। একটু পর পর বলছে—ব্যথা, অনেক ব্যথা। জমে যাওয়া জনসমুদ্র হাসছে। ভূতে পাওয়া মানুষের মতো ভিড় ঠেলে ইসাবেলা জাকিয়া ভাবীর কাছে যায়। জাকিয়া ভাবী—ইসাবেলা ন্যাড়া পাগলিকে জাকিয়া ভাবীদের বাসায় এনে দোর দেয়। ঢাকা শহরের মোটামুটি আধুনিক সিনেমা হলের পাশের গলি মুখরিত হয় একটি শিশুর কান্নায়। বেজন্মা কোনো / কিছু পুরুষের বীজ ন্যাড়া পাগলির বদৌলতে ইসাবেলা নামক এক বাইশের তরুণী আর জাকিয়া নাম্নী তিন সন্তানের জননীর হাতে জন্ম নেয়। পাগলিকেও এদেশের বিকারগ্রস্ত পুংগোষ্ঠীর একাংশ ছাড়ে না।

ত্রিকালে ডুবলো স্নেহের লোটা...

চাকরিটা ভালোই। ইসাবেলা মাইনে যা পায় খারাপ না। এতিমখানায় সামান্য কটা টাকা দিতে ভালোই লাগে। সংসারমুখি না হয়েও ইসাবেলা এভাবেই শিশুসঙ্গ পায়। ও গোলাপিকে খোঁজে। ন্যাড়া পাগলির বাচ্চার খরচ যোগায় এতিমখানায়। পাগলি হলে কী হবে, ঠিকই যতোদিন বেঁচে ছিল জাকিয়া ভাবীর বাসার সামনে মাসে দু মাসে হাজির হতো ভেজা দু চোখ নিয়ে। দু-তিনদিন জাকিয়ার বাসার বারান্দায় থেকে আবার রাস্তার বাসিন্দা রাস্তায়।

ইসাবেলা একটা ভয়ংকর কাজ করে। ন্যাড়া পাগলির বাচ্চাকে দত্তক নেয় সব প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে।

'ভর্তি ফি কতো?'

'সাতচল্লিশ হাজার টাকা।'

ইসাবেলা নামি ইংলিশ মিডিয়ামে বাবলীকে ভর্তি করাবে। লোনের অ্যাপ্লাই করে অফিসে। অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে জানে। ফরম পূরণ করতে থাকে ইসাবেলা, বাবলীর স্কুলের...

নিষ্প্রয়োজন টীকা

সাড়ে আঠারোর ইসাবেলা গোলাপিকে খুঁজে পায়নি আর। কিন্তু মায়া এড়াতে পারেনি। বাইশের ইসাবেলা ধাত্রীর ভূমিকায় জীবনের আশ্চর্যতম মুহূর্ত (মানবশিশু জন্ম)-এর ভাগীদার। ত্রিশের ইসাবেলা অবিবাহিত মা, বাবলীকে দত্তক নিয়ে। কারণ মায়েরা এভাবেই দেশে দেশে, কাজে, দৃঢ়তায় সন্তানদের রক্ষা করেন। সে পথের মা-ই হোন, ন্যাড়া পাগলি অথবা অদ্ভুতুড়ে ইসাবেলা। তারা সবকালেই স্নেহরসে টইটুম্বুর, সব বিপত্তিকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। নিজের মাকে দেখে আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে না!

মনে না হলে প্রথম থেকে আবার ইসাবেলার সাথে হাঁটুন সাহস করে।

বিষণ্ন বেহুলা

প্রেম : দোলে হিয়া দোলে

বটগাছটা রিয়ার ভীষণ প্রিয়। এখানেই দাঁড়িয়ে আসছে সেই ক্লাস ওয়ান থেকে স্কুলবাসের জন্য : ছয়টা পঁয়তাল্লিশ শীত-গ্রীষ্ম সব সময়। শীতের দিনে কুয়াশা, গরমে রোদ আর বর্ষায় বৃষ্টির দেউলিয়া ছাঁট সবই রুখে দিচ্ছে এই গাছ। এমন দারুণ প্রাকৃতিক যাত্রীছাউনি রিয়া এই উলঙ্গ শহরে আর দেখেনি। বাম বেণিটা ডান বেণি থেকে সরু হয়েছে সূক্ষ্ম চোখে রিয়া তা বুঝতে পারে। ওর সাবধানী মন আবার গুণে নেয় বইপত্র রুটিন অনুযায়ী ঠিক আছে কিনা। কারণ বেণি যেদিনই সমান হয় না সেদিনই কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে। বুক ভরে শ্বাস নিয়ে বাতাস ছাড়ে রিয়া। আয়াতুল কুরসী পড়ে বুকে ফুঁ দেয়। ফজরের নামায রিয়া কখনো বাদ দেয় না। আল্লাহ্ রক্ষা করবে ভাবতে ভাবতে বাস এসে পড়ে। জানালার পাশে বসে নিশ্চিন্ত বোধ করে রিয়া। যাত্রার ফাঁড়া মোটামুটি কাটলো। বাস চলতে শুরু করেছে, রিয়া স্বস্তিতে মাথাটা সিটে রাখতে পেরেছে কী পারেনি—জানালার পাশ দিয়ে ছুটন্ত হোন্ডা, কোলের উপর টুকরো কাগজ, চোখের কোণে কিশোরের উড়ন্ত চুল।

কোনো কিছু না ভেবেই কাগজের টুকরোটা হাত দিয়ে আড়াল করে কায়দা করে ব্যাগের পকেটে চালান করে রিয়া। এই টুকরো কাগজের যে এতো শক্তি থাকতে পারে ছোট্ট রিয়ার তা জানা ছিল না। সারাদিন বুক ধড়ফড়, পঞ্চাশবার করা অঙ্কও বোর্ডে ভুল কষে। হাইড্রোজেনের সংকেত বলতে পারে না বিজ্ঞান ক্লাসে। আরবী ক্লাসে 'কাইফা হালুকা'র মানে বলে 'তুমি কেমন আছেন?' সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা! কাগজটা ব্যাগ থেকে বের করে পড়ে ফেললেই এতো হাঁসফাঁস অবস্থার অবসান হয়ে যায়। কিন্তু ও তুষের আড়ালে রাখা জ্বলন্ত কয়লার মতো টুকরোটা রেখে ভজঘটের জন্ম দিয়ে আট পিরিয়ডের স্কুল শেষ করে দুপুর বারটায়; গা ভর্তি জ্বর নিয়ে স্কুলবাসে ওঠে। বাসে একদম শেষ সিটে একা বসে দুই বাই তিন ইঞ্চির কাগজটা খোলে—'আমার যে সর্বনাশ তোমার চোখে। সাড়া মিলবে কি? সায়েম।'

কম করে হলেও একশবার চিরকুটটা রিয়া পড়ে। তারপর কুটি কুটি করে জানালা দিয়ে ফেলে দেয়। পরের চারদিন গায়ে ফোস্কা পড়া জ্বর নিয়ে কুকড়ি মুকড়ি রিয়া পড়ে থাকে বাসায়। ওর সর্বনাশ কে ঠেকাবে? প্রেমজ্বর ছাড়ে পাঁচদিনের মাথায়। এ ক'দিনে সায়েম এসেছে দু বেলা, রিয়ার বড় ভাইয়ের বন্ধু হওয়াতে তার এই নিঃশঙ্ক যাতায়াত। তাতেই জ্বর ছাড়তে এতো দেরি হয়েছে বলে রিয়ার বিশ্বাস। নতুন হওয়া এই রোগের কথা ও কাউকে বলতে পারে না। এমনকি প্রাণের বন্ধু মাকেও না। পিপাসা পায় ঘন ঘন, পড়ায় মন নেই বললেই চলে। বান্ধবীদের সঙ্গ বিষের মতো লাগে। দু চোখের পাতায় শুধু উড়ন্ত কিশোরের চুল, আর সাড়া দেবার আকুলতা। বয়সটা এমনই যখন সবকিছু বিবেচনার আগে শুধু হিয়া দোলে, দুলেই যায় পেন্ডুলামের মতো, এমন কিছুর আশায় যার পরিণতি ঈশ্বর ভিন্ন আর কারো জানার কথা নয়।

রোমিও মাস্ট ডাই

সায়েমদের বাসাটা রিয়াদের মুখোমুখি বলেই কি সহজিয়া নিবেদন? অথবা বন্ধুর ছোট বোন? 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই' টাইপ চান্স নেয়া? নিউ টেনের না-বালক, না কিশোর কি এতোকিছু বুঝেছিল সেই চন্দন সকালে? তার তো দু চোখে কাজলটানার মতো ঢলোঢলো লাবণ্যমাখা মুখের কিশোরী দু বেণি ঝুলিয়ে হাঁটছে। দুলছে—ক্রিকেট ব্যাটে হাত যেন সেই বেণি, ফুটবলে লাথি—অসহ্য। কৃষ্ণের বিষ শরীরে। আঁকুপাঁকু মন মোটামুটি বন্ধু জর্জের বাসায় যাবার জন্যে কেবলই উসিলা খোঁজে। পড়া মাসুদ রানা সিরিজের বই আবার ধার আনতে যায়। বিকেলে ডাক ছেড়ে দঙ্গলের সাথে খেলার চাইতে গলির এ মাথা ও মাথা হাঁটতে বেশি ভালো লাগে। হাঁটতে হাঁটতে যে রিয়াকে বারান্দায় দাঁড়ানো দেখতে পাওয়া যায়! চিড়িয়াখানায় যাবার রাস্তায় রিয়ার স্কুল। সায়েম সেখানে একদিন বুকে মাদলের শব্দ নিয়ে দাঁড়ায়। আলতো করে বলে ফেলে, 'চলো বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাই।' রিয়া যায়। ইডেন গার্ডেনে আদম এবং ইভের যে সখ্যতা তারই টানে ছেলেটা মেয়েটা দৌড়ে দৌড়ে হাঁটে। গাছের আড়ালে মুখ লুকায়। 'ভালো রেজাল্ট করা চাই'—বিমানে লোডারের চাকরি করে এমন একজনের ছেলেকে সেই গার্ডেনে রিয়া শব্দ ক'টা ছুঁড়ে দেয়। সায়েম আকাশের গায়ে পা রেখে হাঁটে। লেখাপড়া করে দারুণ মনোযোগে। স্বনামধন্য এক কলেজের প্রিন্সিপালের মেয়ে আদি ও অকৃত্রিম ধনী-গরীবের বৈষম্যের ফাঁকটুকুতে কিশোরী হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা গুঁজে দিয়ে বসে থাকে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এমন রোমিওদের বাঁচা নেই। আমরা ধরে নেই ঐতিহাসিক পথ অনুসরণ করে এখানেও রোমিও মাস্ট ডাই।

জুলিয়েট, করে যায় সিন ক্রিয়েট

রিয়া কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে 'সায়েম ভাইয়া' ডাকের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে তার নবলব্ধ অনুভূতির চর্চা তরাসেই করে যায়। ছেলের খেলাধূলার চাইতে পড়ালেখায় অধিকতর মনোনিবেশে সায়েমের বাবা-মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সায়েম এসএসসিতে আর্টস থেকে ফোর্থ স্ট্যান্ড করে। রিয়া আনন্দে সায়েমের জন্যে পঞ্চাশ গোলাপের একটা বুকে পাঠায়। প্রেমপর্বের প্রথম পাতা পঠিত হয়ে যায় অভিভাবক মহলে। রিয়ার

তখন ক্লাস নাইনের প্রায় শেষের দিক। স্কুল টিচার মায়ের তত্ত্বাবধানে দিনগুলো ভাজা ভাজা হতে থাকে অকারণ তাপে। ক্বচিৎ চিঠিতে, হঠাৎ দেখাতে একে অন্যকে বলে যায় একটিই কথা—খুব ভালো করে পড়বে যেন কেউ বলতে না পারে আমাদের সম্পর্কই লেখাপড়ার তেরটা বাজিয়ে দিয়েছে। রিয়া এসএসসি পাশ করে মেয়েদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে প্রথম হয়ে। সায়েম ইন্টার দিয়ে রেজাল্টের আশায় বসে থাকে। রেজাল্ট হয়। তার কিছুদিনের মধ্যে স্কলারশিপও। রিয়ার দূরদর্শী বাবা-মা সব ধরনের সুসম্পর্ক বজায় রেখে সায়েমকে এয়ারপোর্টে সি-অফ করেন। রিয়ার ফরসা গালে জল বয়েই চলে। রিয়ার ভাই মনে মনে বলে—শালা, তুই করবি আমার বোনকে বিয়ে! দেখাবো মজা। এখানে ঘটনা পরম্পরায় ডাকবিভাগ খল চরিত্রে আবির্ভূত হবে জর্জের টাকা খেয়ে। রিয়া সায়েমের অনেক চিঠিই পাবে না। রিয়ার চাচাতো ভাই গ্রাম থেকে আসবে ওদের বাসায় থেকে পড়তে। রিয়ার বাবা কথাচ্ছলে একদিন জানিয়ে দেবেন বাবলুর সাথে রিয়ার বিয়ে হবে, রিয়ার বাবা বাবলুর বাবাকে এমন কথাই দিয়েছিলেন। রিয়ার মা রওশন আরার ব্যাপারটা বিশেষ পছন্দ না হলেও তিনি তেমন জোরালো বক্তব্য রাখবেন না, কারণ বাবলু আর যাই হোক বিমানের লোডারের ছেলে না।

এক জোনাকি, দুই জোনাকি জ্বলে, জুলিয়েট ভাসে অভিমান জলে

সায়েমের কোনো খবর রিয়া বহুদিন জানে না। সায়েমের বাবা রিটায়ারমেন্টের পর একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়ে গ্রামে চলে যাওয়াতে সেখান থেকে কোনো খোঁজ নেয়ার পথও বন্ধ। ঢাকা ভার্সিটির টানা বারান্দাও মাঝে মাঝে রিয়ার দু চোখে ম্যাচবক্সের মতো দমবন্ধ করা লাগে, বাবলু পাশে আঠার মতো সেঁটে থাকাতে। রিয়া ইকোনোমিক্স পেয়েছে, পড়ছে। বাবলু তার আগের বছর কোনোমতে হিস্ট্রিতে ঢুকেছে। ফার্স্ট ইয়ারে থাকতেই রাজনীতিতে পাঠ নেয়াতে ইয়ার ফইনালে একটা সেকেন্ড ক্লাস নাম্বার ছাড়া আর কিছুই জোটাতে পারেনি। ক্যাম্পাসে রিয়া বাবলুকে একদিন ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় সবার সামনে, বাবলু রিয়ার বন্ধু সাগরকে অকস্মাৎ ঘুষি মারাতে। সাগর রিয়ার হাত দেখছিল। 'আমার বউয়ের হাত দেখার এতো সাধ কেন তোর শালা বাঞ্চোৎ?'

বাসায় এসে রিয়া খুব কাঁদে, সায়েমের উপর ভীষণ রাগ। রিয়া অনার্স ফাইনাল ইয়ারে থাকতেই বাহার সাহেব, মানে রিয়ার বাবা স্ট্রোক করলেন এবং হাসপাতালের বেডে শুয়ে থেকেই জর্জকে বললেন রিয়া বাবলুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে। অপরাপর বাংলা সিনেমার কাহিনীর মতো সায়েম-রিয়া প্রেমোপাখ্যান এখানেই শেষ হবে রিয়া-বাবলুর বিয়ের মধ্য দিয়ে। শুধু বিয়ের দিন রিয়া কাঁদতে কাঁদতে ফিট হবে সায়েমের প্রতি জমা অভিমানে।

পাপ : আদি

অতঃপর হাওয়া শয়তানের প্ররোচনায় গন্ধম ফল খাইলো আদমসহ, তাঁহারা বিবস্ত্র অবস্থায় পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হইলো।

হাওয়ার পাপটাই এখানে মুখ্য, মানব সম্প্রদায় স্বর্গচ্যুত হবার অন্যতম কারণ হাওয়ার লোভ, গন্ধম ভক্ষণ। এর পেছনে যে হাওয়ার আদমের প্রতি পরম ভালোবাসা কাজ করেছে তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? একা খাওয়া যেতো গন্ধম, সঙ্গীর প্রতি সুতীব্র মমত্ববোধে, প্রেমে হাওয়া তা করেননি। অপেক্ষা করেছেন আদমের। হাওয়াকে আদম এর জন্যে তিরস্কার করেছেন এমনটা ধর্মগ্রন্থের পরবর্তী ধারাবাহিকতায় দেখা যায় না। মানব-মানবীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা সেই জগতের আদি পর্ব থেকেই স্বীকৃত। যুগের বদলে আকর্ষণ প্রকাশের ভাষা কেবল পরিবর্তিত হয়েছে এই-ই যা নব্য সংযোজন। আদম-হাওয়ার স্বর্গপতন যদি পাপ হয়, তাহলে আদি পাপ হয় আসলে হাওয়ার আদমের প্রতি কিংবা আদমের হাওয়ার প্রতি আকর্ষণ। এই চৌম্বক না থাকলে যৌথপতন অনিবার্য ছিল না, আর যৌথপতন না হলে লক্ষ বছরের মানব ইতিহাস টানতে হতো না, এককে মানব প্রজনন বাহিত হয় না বলে।

সায়েমের পাপ কি সেই কুয়াশা ভোরে, উড়ন্ত চুলে রিয়ার কোলে ছোঁড়া চিরকুট? রিয়ার পাপ কি সায়েমের সর্বনাশে গাঁটছড়া বাঁধার অঙ্গীকার? নাকি সামাজিক অবস্থানের বৈষম্য সব পাপের মূল উৎস? সায়েম ডায়েরিটা বন্ধ করে। সায়েমের বোন চিঠি লিখেছে রিয়ার বিয়ের খবর জানিয়ে। সায়েম কাঁদতে ভুলে গেছে বহুদিন। যে সঙ্কল্পে এতোকিছু সেই বাল্যপ্রেমই টাল খেলো। আসলে ওর নৈবেদ্যই ভুল ছিল এমনটাও মনে হয় সায়েমের। বাবা-মা-বোন কারো জন্যে তো এতো পরিশ্রম করেনি, শুধু এক মানবীকে পাওয়ার জন্যে এতো ছোটাছুটি। কারো শুভেচ্ছা মনে হয় আসার সময় নিয়ে আসেনি, তাই এই পতন।

রিয়া কি দীপের সাথে অতিরিক্ত বাজে ব্যবহার করেছিল? যে ছেলেটা চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল—'এতো খারাপ তো আমি না, এমন কেন করছো?' দীপ রিয়ার ক্লাসে ভালো ছাত্র ছিল। ব্যাচে প্রাইভেট পড়তে গিয়ে ঘনিষ্ঠতা। রিয়াকে ভালো লাগার কথা বলতেই রিয়া জ্বলে উঠে বলেছিল—'নিজের দিকে তাকিয়েছো? কালো, বেঁটে এমন ছেলেকে আমি কোন দুঃখে বিয়ে করবো বলো তো!' দীপ মাথা নিচু করেছিল কষ্টে, শোনা যায় না এমন আস্তে বলেছিল—'আমার মনটা কালোও না, বেঁটেও না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি মনের মানুষের অভাবে সারাজীবন অপূর্ণ থাকবে দেখে নিও।'

বাবলুর সাথে পাতা অনিচ্ছার শয্যায় নির্ঘুম রিয়া বহুদিন পর দীপের কথা ভাবে। কবেকার অভিমানী উচ্চারণ এক বালকের! হায়রে, আজ তা এমন করে সত্যি হবে? অবাক লাগে রিয়ার। রিয়া জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে চাকরির। বাবলুর সাথে বিয়ের প্রায় এক বছর হতে চললো। কদিন পরেই রিয়ার মাস্টার্সের রেজাল্ট হবে অথচ বীরপুঙ্গব

এখনো রাজনীতিতে ছাত্রনেতা হিসেবে সক্রিয় থাকবার আশায় ইয়ার ড্রপ দিয়েই যাচ্ছেন।

পাপ : মধ্য

বাবলু যখন ঢাকায় প্রথম এলো তখন প্যান্ট পরাটাও রপ্ত হয়নি। লালমনিরহাটের মানুষ কিভাবে জানবে অতো প্যান্ট পরা? সেই বাবলু রিয়ার মতো মেয়েকে সামলাতে পারবে এমন বিশ্বাস রিয়ার বাবা-মার কেন ছিল তা আজও এক পরম বিস্ময়। আত্মসম্মান যতোটা না তার চাইতে বেশি আত্মগরিমা বাবলুকে ভরিয়ে রাখতো প্রথম প্রথম। প্রেম করেছে, প্রেমিকের জন্যে যখন তখন কাঁদতে বসে তেমন মেয়েকে ও বিয়ে করেছে, এ তো সেই মেয়েকে, তার পরিবারকে বিশাল এক ফেভার করা। নিজের মহত্বে মাঝে মাঝে অজান্তেই বাবলুর বুক ফুলে যায়। বউ চাকরির জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে, শ্বশুর বাড়িতে বসে খাচ্ছে—এসব কোনো বোধই বাবলুর মাঝে আলাদা করে খেলে না। ও ওর মতো করে রাজনীতি করে যায় মনোযোগ দিয়ে। রিয়া বিসিএস-এ কোয়ালিফাই করাতে বাবলু বেশ খুশি হয়। ভাবটা এমন—'হুঁ হুঁ, দেখতে হবে না কার বউ!' আনন্দ কাটতে বেশি দেরি হয় না যখন রিয়ার পোস্টিং হয় টাঙ্গাইলের এক সরকারি কলেজে।

রিয়া জয়েন করে। বাবলুকে বলে ওর কাছে চলে আসতে। এখানেই যা হোক একটা কিছু ব্যবসা-ট্যবসা করার জন্যে অনুরোধ জানায়। বাবলু হেসেই উড়িয়ে দেয়। রিয়াকে কলেজের পাশে বাসা ঠিক করে দেয়। সাথে রেখে আসে বাবলু নিজের দূর সম্পর্কের এক চাচাতো বোনকে। বাবলু প্রতি সপ্তাহে নিয়ম করে রিয়াকে দেখতে যায়। পাঁচ-ছয় দিনের গ্যাপে দেখা হওয়াতে তেমন কথা কাটাকাটি আর হয় না। রিয়া ইনফ্লুয়েন্সিয়াল বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে বাবলুকে একটা ব্যবসাও ধরিয়ে দেয়। মোটামুটি সব গুছিয়ে রিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলে সেই ছেলেবেলার মতো। কখনো কখনো বুকটা খুব ফাঁকা লাগে। অভ্যাসের সম্পর্ক বয়ে যায় বাবলুর সাথে, কিন্তু তাতে প্রাণ নেই, প্রেম নেই। আছে শুধু দায়বদ্ধতার অক্টোপাস আলিঙ্গন!

নতুন কাজ, বাবলু তাই আর ঘন ঘন ঢাকা ছেড়ে টাঙ্গাইল আসতে পারে না। হয়তো পনেরো দিন পরে একবার। রিয়া মাসে একবার যায়। অবসরের সময় অপচয় না করে বাসায় ব্যাচ পড়ানো শুরু করে। ধীরে ধীরে ছাত্রছাত্রী মন্দ হয় না। পড়াতে পড়াতে রিয়ার হঠাৎই একদিন দম আটকে আসে। একটা ছেলে দেখতে হুবহু সায়েমের মতো। একদিন দু দিন রিয়া লুকিয়ে, আড়চোখে শুধু রিফাতকে লক্ষই করে যায়। এতো কচি ছেলে, একে ঘায়েল করা কি রিয়ার জন্যে কোন ব্যাপার! রিফাতকে রিয়া আলাদা দেখা করতে বলে একদিন একটা নোটের রেফারেন্স টেনে। রিফাত আসে। এভাবে রিয়া রিফাতকে স্পেশাল কেয়ারে, মাঝে মাঝেই আলাদা পড়াতে থাকে। আদরের ছলে রিফাতের কপালে আলতো চুমু। সুতা আস্তে আস্তে ছাড়া শুরু হয় নাটাই থেকে। অসম প্রেমে রিফাত হাবুডুবু। বাবলুর অনিয়মিত যাতায়াতের ফোকর গলে রিয়া তাবৎ দুনিয়ার উপর শোধ নেয় নিজের চেয়ে দশ বছরের ছোট রিফাতকে দুমড়ে মুচড়ে চিবিয়ে খেয়ে। রিয়া রিফাতের দেখা না পেলে কখনো বুঝতো না সায়েমের জন্যে ওর মাঝে আসলে কী পরিমাণ হাহাকার সব সময় রয়ে গেছে। শরীরী ভালোবাসার সাথে প্রেমের আকর্ষণ যুক্ত হলে তা কতোটা আশ্লেষের হতে পারে তা রিয়া মর্মে মর্মে বোঝে। একটা বছর রিয়া রিফাতকে নিয়ে ফুলশয্যা রচনা করে। সাক্ষী একমাত্র বাবলুর সেই বার-তের বছরের চাচাতো বোন।

ব্যবসা বাবলুর ভালোই চলে। রিয়ার কানেকশনগুলো বেশ ভালো। রিয়াকে নিয়ে জায়গা দেখে বাবলু একটা স্পেসও ভাড়া নিয়ে নেয় ব্যবসার কাজ করার জন্য। কর্মচারি বাড়ে, কাজ বাড়ে। আর ঠিকাদারির ব্যবসায় উপরতলায় যোগাযোগ খুবই জরুরি। এটা বুঝে বাবলু তার রাজনীতির লিংকগুলোও ব্যবহার করা শুরু করে। সময় যায়। অনেক কিছু থিতু হয়ে আসতে থাকে। রিয়া মোটামুটি শান্ত হয়। রিফাত এইচএসসি পাশ করে ঢাকা পড়তে চলে আসে। আবার রিয়ার নিজের সাথে নিজের থাকা শুরু হয়। কুলসুম কৈশোর পেরিয়ে তারুণ্যের ঘরে ঢোকার তোড়জোড় করছে। রিয়া বাবলুর এই দূরসম্পর্কীয় বোনকে ঠিক কাজের মেয়ের মতো না দেখে আত্মীয়ের মতোই দেখে। কুলসুমকে কাজ চালানোর মতো লেখাপড়াও শেখায়। ভদ্রস্থ একটা চেহারা পেয়ে যায় কুলসুম রিয়ার বদৌলতে। রিয়া কুলসুমকে নিয়ে ঢাকায় ফেরে, ওর বদলি হয়েছে অবশেষে ঢাকায়। এবার নিজের একটা সংসার, সত্যিকারের সংসার। ভালোবাসার মানুষের সাথে নাই বা হলো, একটা সময় ভালোবাসার দাবি ফিকে হয়ে সেখানে দায়িত্ব, নির্ভরতা, প্রজনন ইত্যাদি গাঢ় হয়ে দেখা দেয়।

অন্ত-১

বাবলু-রিয়ার বাচ্চা হবে। দুজনেই মোটের উপর খুশি হয়। আমি-তুমির পারমুটেশন কম্বিনেশনের দিন শেষ হবে দেখে। বাবলু রিয়ার যত্নআত্তি করে যতোটা সম্ভব। প্রথম তিন মাস রিয়া একদম বেড রেস্টে থাকে জটিলতা থাকাতে। এই সময়টা বাবলু কাজ শেষে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরে। কুলসুমের সহায়তায় রিয়ার জন্যে নানা খাবার বানানোর প্রোজেক্ট হাতে নেয়। সব পেরিয়ে রিয়াদের একটা ছেলে হয়। বাচ্চা চাকরি সংসার নিয়ে রিয়ার ব্যস্ততা হয় উচ্চ পর্যায়ের। ব্যাচে ছাত্র পড়ানো, তার সাথে যুক্ত হয়ে রিয়াকে মহাব্যস্ততার নাগপাশে আবদ্ধ করে ফেলে। বেশিরভাগ দিনই রিয়া শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ে। মাঝরাতে আবার জাগতে হয় বাচ্চাকে খাওয়াতে। জীবন চলে একই নিয়মে। বাচ্চার এক বছর হয়।

এক ঝড়ের রাত। পানি খেতে রিয়া ওঠে। বাবলু বিছানায় নেই। কুলসুমের রুমের দিক থেকে শব্দ শুনে রিয়া আস্তে এগোয়। রিয়া সেই রুমের সামনেই সেন্সলেস হয়ে পড়ে। বাবলু কুলসুমের সাথে চূড়ান্ত সঙ্গমে।

অন্ত-২

'কুলসুম, চল্ তোকে দিয়ে আসি। তোর তো একটা ভবিষ্যৎ আছে। তুই বাচ্চা মেয়ে।' রিয়া কুলসুমকে গ্রামে দিয়ে আসে পরের দিন।

'আমি কতো সতী নারীর পতি রে! বিয়ের আগে তুই লটরপটর করিসনি সায়েমের সাথে! আমি বিয়ের পরে করেছি এটা নিয়ে এতো পাড়া মাথায় করার কী আছে? কুলসুমকে নিয়ে আসবি। না হয় তোকে আমি রাখবো না। আচ্ছা থাক, তোর আনা লাগবে না। আমি নিয়ে আসবো।' বাবলু কথা শেষ করে শুয়ে পড়ে।

বাবলু-রিয়ার ভঙ্গিতে বোঝার উপায় নেই এর মাঝে এমন সাংঘাতিক একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। কুলসুম চলে আসে আবার রিয়ার সংসারে।

প্রহার/পতন

'ভাবী তো টাঙ্গাইল থাকতে পিচকি এক পোলার লগে রাতেও থাকছে। আপনার বেলায় এতো বাড়াবাড়ি কেন? আমারে আপনি বিয়া না করেন কিন্তু তাড়ায়ে দিয়েন না। আমার ভালোবাসার দরকার নাই। গেরামে এখন ভাত খাইয়া ইজ্জতের লগে বাঁচার উপায় আমাগো নাই। আপনেই দেইখা শুইনা আমারে একটা বিয়া দিয়া দিয়েন। যদ্দিন বিয়া না হয় তদ্দিন আমি আপনার।' নানা নাটক, কান্নার সহযোগে নিজের আর্জি পেশ করে কুলসুম বীরদর্পে নিজের রুমে ঢুকে যায় রিয়ার সামনে দিয়ে।

'তুই আরেক ব্যাটার সাথে বিয়ার পরেও শুইছস? কথা বল্ শালী, খানকি। ছিনাল। তোরে আমি বিশ্বাস কইরে রাইখা আসছি আর তুই পোলার বয়সী একটা বাচ্চারে নষ্ট করছস?' বাবলুর হাত ব্যথা হয়ে গেলে রিয়াকে মারা ক্ষান্ত দেয়। গাড়ি নিয়ে সেই রাত দুটাতেই বাবলু বের হয়ে যায়। কুলসুম ফোন করে রিয়ার মাকে আনে। নাতিকে কোলে নিয়ে মেয়েসহ রওশন আরা অ্যাম্বুলেন্সে ওঠেন।

চারদিন আইসিইউতে থাকার পর রিয়া সাতদিনের দিন ক্লিনিক থেকে মায়ের বাসায় ফেরে।

মায়ের বাসায় থাকার দশম দিনে রিয়ার কোল থেকে বাবলু বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে। দুধের বাচ্চাকে বাঁচাতে রিয়া নিজের বাসায় আসে। ফিরে আসে রিফাতের ব্যাপারটা জানাজানি হবার ভয়েও। বাবলু দুই পরিবারের সবাইকে রিয়ার কীর্তি জানানোর হুমকি দিতে থাকে ক্রমাগত।

অন্ত-৩

ওদের সংসার আজও টিকে আছে। কুলসুম এখনো আছে। বাবলু তার সাইনবোর্ড 'রিয়া' এতো সহজে হাতছাড়া করবে না। এই নিয়ন সাইনের আড়ালে অনায়াসে কতো কিছু করা যায়!

রিয়া ছেলেকে মন দিয়ে মানুষ করার চেষ্টা করে।

শেষের কবিতা

ঢাকা-চিটাগাং রুটে একটা বাস অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। বাবলু সেরিনা সহ আহত। সেরিনা বাবলুর সেক্রেটারি। রিয়া হাসপাতালে বসা। রোগী দুজনের কেউই আশংকামুক্ত নয়। রিয়ার গালে সেই আরেকদিনের মতো জল যেদিন সায়েমকে এয়ারপোর্টে বিদায় দিয়েছিল। আধুনিক বেহুলা স্বামীকে নিয়ে ছোটাছুটি করতে থাকে। আরেকটা চিরবিদায় সইবার শক্তি রিয়ার একদমই নেই। ওর পা ভেঙ্গে আসে, নাকি মন?

সায়েম ডায়েরি খোলে—সম্পর্ক কি চর্চার জিনিস? অচর্চায় কি যে কোনো সম্পর্ক নষ্ট হয়? এখানেও কি নদীর মতো ড্রেজিংয়ের দরকার হয়? পরিণত বয়সের মানুষের জীবনে কি যৌনতা অনেক বড় কোনো ভূমিকা পালন করে সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণে? রাত ঠিক তিনটা। সায়েমের দেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষার অন্যতম নির্ভরযোগ্য বাহন 'টেলিফোন' অশুভ সংকেতের মতো বাজতে থাকে, ক্রিং, ক্রিং... রিয়ার মোবাইলও বাজে 'অপারেশন সাকসেসফুল', বেহুলার ভেলা আবার ভাসতে থাকে মাধ্যাকর্ষণের সূত্রে।

এক চিমটি, অফিস

সে এক সময় ছিল আমি যখন কাজকে ভালোবাসতাম। দায়ের মতো, বোঝার মতো বোধ হতো না। আমি দিনে চৌদ্দ ঘণ্টাও কাজ করেছি। খারাপ লাগেনি। এখন লাগে। এখন আমি অল্পতেই ক্লান্ত হই। রাগ লাগে। মাত্র বছর তিনেকের মধ্যে নিজের এই পরিবর্তন আমাকে আহত করে। এখন আগের চাইতেও বেশি কাজ করতে হয়। কিন্তু সেখানে আনন্দ নেই। শুধুই দায়বদ্ধতার এক অসুস্থ সময় যাপন। অফিসে গিয়ে ঐ অসুখী মুখগুলো আবার দেখতে হবে ভাবতেই আমার সব জীবনীশক্তি হারিয়ে যায়। সেই একই একই কথা। একই একই মানুষেরা, বছরের আবর্তে হয়তো মুখ বদলে কিন্তু ছাঁচ বদলে না। এও ভাবি, আমার সম্পর্কেও হয়তো অপর কোনো ব্যক্তি বা পক্ষ এই কথাগুলোই ভাবছে। মানুষের মনে হয় এ এক অলিখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সে নিজেকে অপরের চাইতে স্বতন্ত্র ভাবে। আমি বেকুবও তার বাইরে নই। ছোট্ট একটা অর্থলগ্নিকারী অফিস, ত্রিশজনের মতো মানুষ। কতো সুন্দরভাবে থাকা যায়। থাকি না। আমাদের গ্রামের ভাষায় একটা কথা বলে, পুটকিতে আঙ্গুল দেয়া—উপর থেকে নিচ পর্যন্ত সবাই সযতনে এই একটা কাজ নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। প্রথম যখন এলাম এবং এসব দেখে সদ্য শিক্ষাজীবন শেষ করা আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে তখন আমাকে আমার প্রথম বস বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের ছেলে বলো, মেয়ে বলো সন্ন্যাসী (আমাকে আদর করে ডাকতেন) বেশিরভাগেরই লক্ষ্য থাকে পড়া শেষে ভালো একটা চাকরি, তারপর বিয়ে, এরপর বাচ্চা...এর মাঝেই তুমি-আমি সবাই ঘুরছি। কেউ দেখবে পত্রিকাটাও পড়ে না। অথচ মানুষ মাত্রেরই কোনো না কোনো আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য থাকে যা তাকে হাজার মানুষের মধ্যেও আলাদা করে। তো প্রত্যেকে তার সব প্রতিভা যখন কর্মক্ষেত্রে ঢেলে দেয় তখনই শুরু হয় কনফ্লিক্ট। বুদ্ধিমানরা এগুলো পজিটিভ দিকে টার্ন করাবে। আর গার্বেজরা নিজেরা এসবে অংশগ্রহণ করবে। এই মানুষগুলোর এই গণ্ডি। এরা সকালে অফিসে আসে, বাসায় গিয়ে টিভি দেখে, রান্না করে, ঘুমায়, রুটিনের সঙ্গম করে। এদের আচরণে দুঃখ পাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়, সন্ন্যাসী। দেখে যাও। পার্টিসিপেট করো না। পর্যবেক্ষণ করো, লেখার অনেক উপাদান, গল্প পাবে।'

আমি সেই থেকে তাই করে যাচ্ছি এবং অংশগ্রহণ না করাতে আমাকে অনেকেই প্রতিপক্ষ ভাবে। অহংকারী, উদ্ধত মনে করে। কে জানে, এটাও হয়তো আমার উর্বর মস্তিষ্কের সৃষ্টি কোনো ভ্রান্তিবিলাস নিজের গুরুত্ব বাড়াতে। আত্মতৃপ্তির এক ধরনের বিকল্প, মনে মনে ভাবা—হুঁ হুঁ, আমি তোমাদের মতো নই, তোমাদের চাইতে উচ্চস্তরের কেউ। আদতে তো ছাগল। ষড়যন্ত্র করতে যে ফুলপ্রুফ প্ল্যান লাগে তা করার যোগ্যতা হয়তো আমার নেই। আর তা নেই বলেই আত্মরক্ষার্থে এই 'অন্যরকম'-এর ভেক্! লগবুকে যদি অফিস রাখি তাহলে এর বিভিন্ন চরিত্ররা আসলে কিভাবে উঠে আসবে?

৩০.০৮

নতুন শাখায় এলাম। এর আগে আমি মরিয়ম ইসলাম অন্য আরেক শাখায় সেকেন্ডম্যান থুক্কু সেকেন্ড ওম্যান হিসেবে কাজ করেছি। আজকে আমার পূর্ণ আনন্দের দিন। পনেরো বছরের সফল প্রাপ্তি। সেইসব দিন আমার! সব কি ঘুচে যাবে! আশা করতে দোষ কী!

কোনোসব দিন কাটিয়েছে আমার নতুন বস? আহা, আমি তো কারো বদনাম করতে পারি না, অংশগ্রহণও করি না। শুধু কান খোলা রাখি, খবর আমার কাছে পায়ে হেঁটে চলে আসে।

স্মৃতির খোলা জানালায়

আপনাদেরকে আগেই বলে রাখি, এগুলো কিন্তু সব শোনা কথা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস না করে স্রেফ জেনেই যান না। এমন তো আমাদের সবারই ইতিহাস খুঁড়লে একটু-আধটু পাওয়া যাবে, না কী বলেন! অতীত ছাড়া কি মানুষ হয়?

'মৌরী, চলো, আজকে হোন্ডায় উঠবে।'

'চলো।'

আহা, নব্বইয়ের দশক একাশি-বিরাশি সাল অনেকের জন্যে কী আনন্দেরই না ছিল! অনেকের বাবাই ব্যবসায় জড়িয়ে গেছে যুদ্ধের পরপরই। যারা একাত্তরে নিতান্ত বালক-বালিকা ছিল তারা তখন তারুণ্যের বুড়ি ছুঁয়েছে, এরা নব্য উঠতি ব্যবসায়ীদের আদরের 'লাল'। মৌরী ওরফে মরিয়ম তো এমন লালই চেয়েছিল। দেখতে যেমনই হোক, কোনোভাবে বড়লোকের ছেলে বাগাতে হবেই। মরিয়মের বাবা তাদের সাত ভাইবোনের এক বিশাল দঙ্গল রেখে বিয়ের মাত্র নয় বছরের মাথায় হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। মরিয়ম ভাইবোনদের মাঝে দ্বিতীয়। সেই এক সময় গেছে মরিয়মদের। মামার বাড়ির দয়ায় গ্রাসাচ্ছাদনের উপায়। তারপর বাবার চাকরিটা মায়ের পাওয়া। একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচা। ক্লাস টেনেই বড়বোনকে এক প্রবাসী ছেলের কাছে বিয়ে দিয়ে মরিয়মের মা মরিয়মকে রীতিমতো আতংকিত করে তোলেন। নিজের পড়ার খরচ যেন নিজেই যোগাতে পারে, এই লক্ষ্যে মরিয়ম যেমন প্রাইভেট টিউশনি শুরু করে তেমনি আরো বেশি মনোযোগী হয় লেখাপড়ার প্রতি। যে কোনো মূল্যে হোক নিজের এই দারিদ্র্যের অবসান ঘটাতে হবে এবং অবশ্য অবশ্যই বড়লোকের দুলাল কোনো ছেলেকে বিয়ে করতে হবে, সামগ্রিক নিরাপত্তার জন্যে। এই স্থির লক্ষ্যে মরিয়ম সব সময়ই লেগে থাকে।

ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চান্স পেয়ে মরিয়ম দম ফেলে। ভর্তি যখন ইকোনোমিক্সে হয়েছে, পাশও হয়ে যাবে। ব্যস, মরিয়ম এবার দ্বিতীয় প্রকল্প ধনী বর খোঁজার কাজে মনোনিবেশ করে। রাহাত ডিপার্টমেন্টে এক রকমের আতংক। এই সাঁ করে হোন্ডা নিয়ে এলো তো কালকে গাড়ি। পরশু কোনো কারণে এক চড় তো তারপরের দিন কোনো বারে মারামরি। মরিয়ম অবলোকন করতে থাকে। খোঁজখবর নেয়। ব্যবসায়ীর ছেলে। গুলশানে বাসা। তিনবোনের এক ভাই। ইতিকর্তব্য মোটামুটি ঠিক করে মরিয়ম আস্তে আস্তে সুতো ছাড়ে।

সেই সুতোতে জড়িয়ে এই যে রাহাতের মৌরীকে হোন্ডায় উঠবার আমন্ত্রণ। উদ্দাম জীবন। ভার্সিটি শেষ করবার আগেই মৌরী-রাহাতের বিয়ে হয়ে যায় রাহাতের বাবার প্রবল বাধা সত্ত্বেও। মৌরী পড়া একসময় শেষ করে। রাহাতও। রাহাত সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় ঢুকে যায়। রাহাতের কোনো পরিবর্তন কিন্তু হয় না। ও তেমনই থাকে বেপরোয়া, নারীঘেঁষা, মদারু। মৌরীর মোটের উপর খারাপ লাগে না। রাহাতের সাথে পার্টিতে যায়। পান করে। বিয়ের তিন বছর পার হবার আগেই মৌরীর ছেলে হয়, টিটো। মাঝে মাঝে রাহাতের অন্য নারীঘেঁষা স্বভাবটা মৌরীর অসহনীয় লাগলেও কিছু বলে না। দিনশেষে রাহাত তো ওর কাছে আসবেই। সবকিছু নিয়ে অশান্তি করতে মৌরীর ভালোও লাগে না। মরিয়ম প্রমাণ করে ছাড়ে লক্ষ্য ঠিক থাকলে, শ্রম দিলে ফসল ঘরে উঠতে বাধ্য।

মরিয়মের আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাহাতের বাবা-মা একসময় মৌরীকে মেনেও নেয়। মৌরী তার ছোট ভাইবোনদের রাহাতের সহায়তায় এস্টাব্লিশ্ করার ব্যাপারে মন দেয়। হঠাৎই বিনা মেঘে বজ্রপাত। কে জানে, মেঘ মনে হয় ছিল শুধু রাহাত-মৌরী তা বুঝতে পারেনি। শরীর খারাপ, শরীর খারাপ। শেষে ফলাফল রাহাতের ফুসফুসে ক্যান্সার। দৌড়ঝাঁপ, এদেশ-ওদেশ করে কোনোমতে চিকিৎসা চলে। রাহাত পুরোপুরি বাসায় বসে যায়। বিয়ের সাত বছরের মাথায় মৌরী এই অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানে রাহাতের বাবার রেফারেন্সে কাজে যোগ দেয়। রাহাতের জন্যে ভালো জীবনের শর্তপূরণ, টিটোর ভবিষ্যৎ যেমন মুখ্য হয় তেমনি সারাদিন একজন অসুস্থ মানুষের কণ্ঠলগ্ন হয়ে থাকার হাত থেকেও চাকরিটা মৌরীকে মুক্তি দেয়।

সাতাশি-আটাশি সালে মেয়েদের চাকরি, তাও আবার ফিন্যান্স সেক্টরে! এন্ট্রি লেভেল। চিরদিনের উচ্চাভিলাষী মৌরী কি আর এতে সন্তুষ্ট থাকে! বর তো থেকেও নেই। আছে ফাস্ট লাইফের সবটুকু অভিজ্ঞতা রাহাতের কল্যাণে। ব্যস, বসদের মনোরঞ্জন চলতে থাকলো, মাঝে মাঝে দেশের বাইরেও যাওয়া যায় বসদের খরচে। মন্দ কী! ঐসব বস্তাপঁচা সতীপনা মৌরীর ঠিক পোষায় না। রাহাতের ফুসফুসের সাথে হার্টেরও সমস্যা দেখা দিয়েছে। একদিকে ক্যান্সারের ধকল অন্যদিকে দুর্বল হার্ট। কোনোভাবেই তাকে উত্তেজিত করা যাবে না। জীবনের অল্প কয়েকটা বছর কাটানোর আগেই মৌরী স্বামীসঙ্গ থেকে একরকম বঞ্চিতই হয়। রাহাতের শুধু বেঁচে থাকার যুদ্ধ। আর মৌরীর সুস্থভাবে নিজের সব মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে ভদ্রস্থভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এক ছাদের নিচে থাকলেও সম্পর্কটা শুধু সামাজিক প্রয়োজন এবং দায়িত্ববোধের নাগপাশে বাঁধা পড়ে যায় রাহাতের সাথে।

এভাবে চলে কয়েক বছর। ধীরে হলেও চাকরিতে মৌরীর উন্নতি হয়। মৌরী এই সেক্টরের উপর বিস্তর পড়াশোনাও করে। তার ওপর বসদের নেকনজর তো আছেই। এতোকিছু সত্ত্বেও মৌরী একবার ফেঁসে যায় অর্থ কেলেংকারিতে। নারীদের প্রধান অস্ত্র কান্না এবং অভিনয় খুব কাজে আসে। পালের গোদার চাকরি গেলেও মৌরী কোনোমতে বেঁচে যায়।

সাগরপাড়ের মানুষেরা, চর এলাকার মানুষেরা, কিংবা যারা নদীর খুব কাছাকাছি থাকে, তারা এতো ভাঙ্গাগড়া, ঝড়-সাইক্লোন দেখে যে তাদের একসময় এসব ব্যাপারে এক ধরনের ঔদাসীন্য চলে আসে। মৌরী সেই ছোটবেলা থেকে এতো সংগ্রামের মাঝে আছে যে, কোনো সহানুভূতি কারো প্রতি ওর আর কাজ করে না। ও যেটা পায়নি অন্যে সেটা পেলে, অন্যকে সুখী দেখলে ওর গা জ্বলে। সেরকম ব্যবহারও ও সেসব সুখীলোকদের দেয় যাতে তাদের সুখ উবে যায়।

কী বুঝলেন আমার বসের অবস্থা? ঝাক্কাস না!

যুবরাজ হতে চাই...রাণী মা কোথায় পাই?

ইনি আমাদের ক্যাশরাজ। মানে টাকার জন্যেই জন্ম, টাকা বিছিয়েই মরতে চাই টাইপ আর কী! টাকা কে না চায় ভাই, কিন্তু ভব্যতার একটা ব্যাপার আছে না! একদম নর্দমার ভেতর থেকেও দাঁত কামড়ে টাকা তুলে আনতে হবে? শোনা কথা নয়, আমার দু চোখে দেখা।

'ওই সিঙ্গাড়া কতো নিছে?'

'চার টাকা।'

'এক টাকা ফেরত দে।'

ক্যাশরাজের পিয়নের সাথে কথোপকথন।

এই ক্যাশরাজই কিন্তু সামনে যদি বস্ থাকে তাহলে এই একই পিয়নকে পাঁচ টাকা বখশিস্ও দিয়ে বসবে। কারণ? বসের সামনে দিলে ও যে কতো দিলদরিয়া তা প্রমাণ হবে। আমার সামনে কিংবা অন্য কারো সামনে তো সে মহান সেজে লাভ নেই। আমি তো তার চাকরিতে উন্নতি আনতে পারবো না।

ব্যাকগ্রাউন্ড একটা বড় জিনিস। কোথায় পড়েছেন, কী পড়েছেন, আপনার আশেপাশের বন্ধুবান্ধব কারা, রাজনৈতিক বিশ্বাস কী, ইত্যাদি ইত্যাদি আমি মনে করি চাকরির ক্ষেত্রে দেখা উচিত। ক্যাশরাজের কথা ধরেন—দাদা ছিল মুসলিম লীগ, বাবা রাজাকার, চারদলের ঘোর সমর্থক। লুঙ্গি ব্যবসায়ী। ছেলেকে শিক্ষিত করবে এই আশায় শহরে প্রেরণ। বংশের কেউ চাকরিতে নেই। সে আছে নানা ব্যবসাসহ। সে যে কতো বড় চাকরি করে তা তার হাবভাবে প্রতিনিয়ত ফুটে ওঠে।

ইসলাম মানুষের মধ্যে শ্রেণী অনুমোদন করে। বারেককে তুই বলি তো কী হয়েছে? চাকর তো চাকরই।

রামগাধা জানে না ও নিজেও চাকর। চাকরির পাশাপাশি দাদনের ব্যবসা করে। ইসলাম কিন্তু সুদ খেতে মানা করেছে সেটা মানে না। পিয়ন বারেকের জন্যে ইসলামের নিয়ম বলবৎ তিনি (ক্যাশরাজ) ইসলামের ম্যান্ডেট নিয়ে দুনিয়াতে আসছেন বিধায় তার জন্যে দাদন ব্যবসা জায়েজ।

ক্যাশরাজ সারাদিন বসের রুমেই থাকে। বসের চেম্বার সার্ভিস যে কর্মক্ষেত্রে উন্নতির আসল চাবিকাঠি তা ক্যাশরাজ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এবং পালনও করে।

আরে ভাই, অফিসটা তো আমিই চালাই। আপনার ব্যাপারটা আমি দেখবো।

থার্ডগ্রেড এম্প্লয়ি তারচাইতে সিনিয়র একজনের ব্যাপারটা দেখবে। কারণ বসের সে আস্থাভাজন।

'মোখলেসকে সরিয়ে দেন।'

'কেন?'

'স্লো।'

আসলে মোখলেস ক্যাশরাজের দুনম্বরি দেখে ফেলেছে। বস্ মোখলেসকে সরিয়ে দিয়েছে।

আমার অফিস একটা বাংলাদেশ। ছিল খালেদা, দেশ চলেছে 'হাওয়া'র কথায়। সেখানে জনগণ কোথায়?

উপায় নাই গোলাম হোসেন

কুটির (আমাদেরটা তো প্রাসাদ না, কুটিরের মতো) ষড়যন্ত্র চলে। এক এক সময় এক একজন বলি। পরিবারহীন বসের রাগ কেন পর্সিয়ার বর আছে। সুলতার বাচ্চা কেন সুলতার কাছে থাকে? বসের বাচ্চা তো থাকে বিদেশে। লন্ডন পড়তে গেছে যে আর আসেনি। এর মাঝে গোলাম হোসেন কাজ করেই যায়। সকালে গোলাম হোসেন যে ভঙ্গিমায় চেয়ারে একধ্যানে কাজ করে, অফিস থেকে বের হবার সময়ও তাকে একই ভঙ্গিমায় দেখা যাবে। মেরুদণ্ড না থাকাতে বসের দারুণ প্রিয়। বাসার মাস খরচের বিবরণটাও বসের গোলাম হোসেন লিখে দেয়। এতো উপকারী অফিসপালিত প্রাণী আর দুটি নেই। এই ধ্যানীও মাঝে মাঝে খেলতে চায়। খেলেও। নিজের চামড়াটা তো সবারই প্রিয়। সেটাতে বেশি আঁচড় পড়া শুরু হলে কেন বরদাশ্ত করবে?

'রূপা তো একদম কাজ করে না। সারাদিন মোবাইলে চক্কর।' চলে রূপাকে আড়ং ধোলাই। আদতে রূপা আছে বলেই গোলাম হোসেন এখনো ক্যাশরাজের মতো নমুনাকে নিয়ে চলতে পারছে। আহা! বসের সামনে সারাদিন বিড়াল হয়ে থাবায় জং পড়ে গেলো যে! রূপাকেই না হয় একটু বাঘগিরি দেখায় গোলাম হোসেন! বাংলার তাবৎ পুরুষ যারা কর্মক্ষেত্রে নির্যাতিত তারা তো বাইরে বিড়াল ঘরে বাঘ।

খোলো খোলো দ্বার...

'এতোদ্বারা এই শাখায় কর্মরত সকলকে এই মর্মে অভিহিত করা যাইতেছে যে, কিছু অনিয়ম সংঘটিত হইবার কারণে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই শাখার সকল কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে এবং কর্মচারিরা সাময়িক সাসপেনশনে থাকিবেন।'

আজকে আমি, বস, সুলতা, ক্যাশরাজ সবাই একসাথে নোটিশটা পড়ছি। এখন সবাই এক কাতারে। আমাদের চাকরি নেই। শ্রমবাজারে আমাদের কোনো খদ্দের নেই। সবাই বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে ভাবছি কবে খুলবে এই দরজা, আদৌ কি খুলবে? কেউ কারো পেছনে লাগছি না। আমাদের সকল সঙ্গীত একটিমাত্র ইঙ্গিত 'চাকুরীচ্যুতি'-তে কী মর্মান্তিকভাবে গিয়াছে থামিয়া। এতো দুঃখের মাঝেও আমার কেন যেন হাসি পায় বসের দ্বিতীয় বর (অফিস)-এর এই পরিণতিতে। আমাদের ঠেলে ইনভেস্টিগেট করার জন্যে গঠিত বিশেষ টিম ভেতরে ঢুকে যায়। মেঘলা ছিল আকাশটা, সকাল থেকে হঠাৎই সূর্যের তেজে আমাদের গা পুড়তে থাকে। এতো তাপে মনে হলো এইমাত্র নতুন দিন শুরু হলো। আমি রোদে চোখ মেলে সেই ছাত্রজীবনের মতো হাঁটতে থাকি...মন একটি অলিখিত সাদা কাগজ এমন ভাবনা নিয়ে।

বাণিজ্যে, বসতে লক্ষ্মী

এক

ধেয়ে বৃষ্টি আসছে। কিশোর সকালে সবেমাত্র চায়ের বিনিময়ে সবাই অ্যাকশন দেখানো শুরু করেছে এমন সময়ে নটী বৃষ্টি না এলে কী হতো! বিরক্তি চেপে মিনহাজ মনে মনে ভাগ্যকে শাপশাপান্ত করে। এমনিতেই মরে আছে। তার উপর প্রকৃতির এই ছোবলে ও জানে না কতোক্ষণ জমায়েত ধরে রাখা যাবে।

গরম গরম স্লোগান দিয়ে মিনহাজ আসন্ন বৃষ্টির ঠাণ্ডা ছাঁট বাঁচিয়ে শ্রমিকদের উষ্ণ করে তোলার প্রয়াস পায়।

শ পাঁচেক মানুষ ওর সাথে হাতের মুঠি আকাশে তুলে কম্পন তোলে—'দুনিয়ার মজদুর এক হও। শোষণের কালো হাত ভেঙ্গে যাক, ভেঙ্গে দাও।'

পরিণতি কী হবে যেমন মিনহাজ জানে না তেমনি ওর সাথে যারা আছে তারাও জানে না। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ কি আর পরিণতির কথা ভাবে? ভাবে না।

এক কেজি চালের দাম বাইশ টাকা। ঘর ভাড়া সেই বস্তিতেও চলে যায় বার শ টাকা মাসে। এক রুমে চারজন। এক চৌকিতে দুজন। সকালে বাথরুমের লাইন। পানির তীব্র সংকট। মিনহাজ আর ভাবতে চায় না। ওর মাথাটা ফেটে যাবার উপক্রম হয় ক্ষোভে।

পরিস্থিতি কোনোভাবেই ভালো না। আশপাশে পুলিশও জমছে। মিনহাজ মাপজোখ করে নেয়। আর যাই হোক পুলিশের পিটুনিতে আহত হওয়া চলবে না। বামদিকে টহল একটু কম। মিনহাজ ঠিক করে পুলিশ লাঠি চার্জ করলেই ও বামদিকে দৌড় লাগাবে। ওকে ঘিরে থাকা ছেলেগুলোকে সেভাবেই মিনহাজ বলে রাখে। মিছিলের সামনে থাকা মেয়েদের বলে দেয় বিপদ দেখলে যেন সটকে পড়ে। এখন আর সেদিন নেই যে পুলিশ ছেলেমেয়ে দেখে পেটায়। পেটায় নির্বিচারে। অন্য সবকিছুতে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত না হলেও মারের ক্ষেত্রে পুলিশ সমান প্রাপ্য বরাদ্দ রেখেছে। এও এক ধরনের উন্নয়ন। নিজের গুছানো ভাবনায় হট্টগোলের মাঝেও মিনহাজের ঠোঁটে হালকা হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

মিনহাজরা অগ্রসর হতে থাকে। গলার রগ ফুলে ওঠে।

'আমাদের দাবি, আমাদের দাবি, মানতে হবে, মেনে নাও।'

মোবাইলে খবর আসে সাভারের কিছু গার্মেন্টসেও শ্রমিকরা ওদের মতোই বের হয়ে এসেছে।

ঢাকা ইপিজেড রণক্ষেত্র।

বাহ্, রাস্তা বন্ধ করতে তো ভালোই লাগে। মিনহাজের ইচ্ছে করে খালি রাস্তায় শুয়ে পড়তে। যেখানে থাকে সেই এলাকায় গত রাতে এক মিনিটের জন্যেও ইলেকট্রিসিটি ছিল না। পাশের জনের গায়ের ঘাম আর ওর নিজেরটা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে, ঘুমাতে পারেনি একটুও। সকালে যে গোসল করে নির্ঘুম রাতের ক্লান্তি দূর করবে তারও কোনো উপায় ছিল না। কারেন্ট নেই তো পানিও নেই। সহজ হিসেব। কোনো রকমে সকালে বাথরুম করা গেছে, এই আর কী!

'মিনহাজ ভাই, পুলিশ আমাদের আর সামনে যেতে দেবে না। সামনে পাঁচটা ফ্যাক্টরি। ওরা রিস্ক নিতে চায় না।'

'তোরা আগা। আজকে কোনো পিছানো নাই। পুলিশ পিটাইলে অগোরেও আজকে ঢিলাবি।'

মিছিল ধীরে ধীরে জঙ্গি রূপ নেয়। সামনের গার্মেন্টসে মিছিল থেকে কে যেন ইট ছুঁড়ে মারে। সাথে সাথে চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হয়। বৃষ্টির সাথে বৃষ্টিরই মতো শুরু হয়ে যায় ঢিলাঢিলি।

'এই মার্। ছোটলোকের বাচ্চাদের পিটা।' পুলিশের এক কনস্টেবলের উচ্চারণে অন্যরা উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গরম পানি। টিয়ার সেল। লাঠির ধুপধাপ, মিছিলকারীদের বাবারে-মারে ডাকে কেমন যেন ধোঁয়া ধোঁয়া বাস্তবতায় চারদিক ঢেকে যায়।

ঘুমহীন মিনহাজ, সকালে নাশতা না করা সঙ্গীরা বেশিক্ষণ এই রাবণের দলের সামনে টিকে থাকতে পারে না। মাথায় একটা বাড়ি পড়তেই মিনহাজ রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। নেতার পতন অন্যদের বিভ্রান্ত করে তোলে। কোনো রকমে মিনহাজকে কাঁধে তুলে বাকিরা ভোঁ দৌড় লাগায়।

দুই

'না না, এভাবে তো চলতে পারে না।' গার্মেন্টস মালিকদের জরুরি সভা ডাকেন। 'আজকেই আমরা সংবাদ সম্মেলন করবো।'

'প্রবীর, আপনি ক্রোকোডাইল গ্রুপের সামাদ সাহেবকে ফোনে দেন তো আমাকে। বুঝলেন, সব ষড়যন্ত্র।'

'আমরা কি এ ব্যাপারটা হাইলাইট করবো, আজকের প্রেস ব্রিফিংয়ে?'

'অবশ্যই।'

'এটা সবচাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা।'

জগলুল সাহেব সামাদ সাহেবকে ফোনে বলেন, 'একবার শুধু 'ষড়যন্ত্র' শব্দটা বাতাসে দিতে পারলেই হলো, দেখবেন সরকার বিরোধীদলকে আর বিরোধীদল সরকারকে কিভাবে তুলোধুনো করে।'

'তাতে আমাদের লাভ?'

জগলুল হেসে ওঠেন। 'আরে ভাই, আপনার বয়স কতো হলো? আক্কেল দাঁত উঠছে? সামাদ ভাই, এই ইস্যুতে কিন্তু নীতিনির্ধারক কাউকে একমত হতে দেয়া যাবে না। রেগুলেটরি বোর্ড যদি একবার বসে তাহলে আর নয়শ টাকায় কাউকে খাটানো লাগবে না আপনার সোয়েটার কারখানায় মনে রাখবেন। যা বলি শোনেন।'

জগলুল সাহেব গত সপ্তাহে একটা সিআরভি গাড়ি কিনেছেন বিবিএ পড়া মেয়ের জন্য। বনানীতে একটা ফ্ল্যাট বুকিং দিয়েছেন দেড় কোটি টাকার। যদিও ব্যাংকের লোন নিয়েছেন আয়কর ফাঁকি দেবার জন্য। এখন উনি একটাকা বেতনও কারো বাড়াতে পারবেন না।

বিদেশী বায়াররা এলে দামি গাড়িতে না চড়াতে পারলে প্রেস্টিজ থাকে!

গ্রাম থেকে আসে, হাঁটতে হয় কিভাবে সেটা পর্যন্ত জানে না। এদেরকে শিখিয়ে পড়িয়ে কাজের উপযোগী করতেই তো জান শেষ। সেখানে আবার বেতন চায়। নয়শ টাকায় হবে না। আরে, আমরা আছি বলে তো তাও নয়শ টাকা চোখে দেখছিস, তা না হলে তো বাসাবাড়িতে ঝিয়ের কাজ করতি! খুন্তির ছ্যাঁকা খেতি অথবা রিকশা চালাতি। এক একজনের যা স্বাস্থ্য, রিকশাও বেশি টানতে পারতি না!

বিরক্তিতে জগলুল সাহেব চোখ কুঁচকান। যত্তসব ফালতু ঝামেলা!

তিন

'ডলার কতো আজকে?'

'চুয়াত্তর।'

'মারছে আমারে! আমাদের তো আর বাঁচন নাই।'

'কেন? অর্থমন্ত্রী তো বলেছেন স্মরণকালের সর্বোচ্চ বৈদেশিক রিজার্ভ আছে এবার দেশে।'

'ভাই, না খেয়ে টাকা জমিয়ে লাভ আছে কোনো? উনি ভল্টে কোটি ডলার রিজার্ভ রাখেন, আমার তো পেমেন্ট করতে হবে ডলারে। যে ডকুমেন্ট ছাড়াতে লাগতো পঁয়তাল্লিশ লাখ এখন লাগবে পঞ্চাশ। আমার কী হবে? সামনে ঈদ। বেতন বোনাস ঠিক সময়মতো না দিতে পারলে কারখানায় কর্মচারি শ্রমিকরা স্রেফ লটকিয়ে দিবে। কী যে বেহুদার মধ্যে আছি সানাউল্লাহ সাহেব। আপনারা ব্যাংকার, আপনাদের চাইতে ভালো আর কে বুঝবে!'

'এনাম ভাই, এতো ফ্রাস্টেটেড হবেন না তো। কিছু একটা ব্যবস্থা হবে। বাংলাদেশে কবে কোন আন্দোলন ঠিকঠাক চলেছে বলেন? ডোন্ট মাইন্ড, আপনারা ব্যবসায়ী, নিজেদের পুঁজি ব্যবসা দুটোই বাঁচানোর একটা লাগসই সমাধান দেখবেন। বড় বড় যারা আছে বের করে ফেলবে। নেন, কফি খান।'

করেছে! এই চাই, ওই চাই। বুঝলেন, সব হলো চাল, চাল। বোকা গাধাগুলো বোঝেও না।'

'আজকে আসি সানাউল্লাহ ভাই। দেখি টাকার কী ব্যবস্থা করতে পারি। কালকে ডকুমেন্ট রিটায়ার করাবো ইনশাল্লাহ।'

'বস, এনাম ভাই, ইনশাল্লাহ বলবেন না। বলেন, এনশাল্লাহ। এটা জাতীয়তাবাদী উচ্চারণ, হাহ্, হাহ্।'

চার

'সময়ের সাথে সরকারের পথে' নিউজে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ, খবর পড়ছি আমি আম্বারউদ্দিন হায়দার পেয়ারা।

এইমাত্র পাওয়া খবরে আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি জানালেন, পোশাক শিল্পে ন্যায্য মজুরির দাবিতে শ্রমিকদের চলমান আন্দোলনের ইস্যুগুলো আলোচনার জন্য চেম্বার অফ কমার্সে মালিক সমিতি এক বিশেষ বৈঠকে বসেছেন। তাঁরা প্রয়োজনে সেনাবাহিনী মোতায়েনের মাধ্যমে তাঁদের শিল্পকারখানার নিরাপত্তা চেয়েছেন। ব্যবসায়ী সমিতি আরো বলেন, একটি বিশেষ গোষ্ঠী যারা চায় এদেশ থেকে এই শিল্প ধ্বংস হয়ে যাক তারা এই আন্দোলনের পেছনে মদদ দান করছে।

সালেহা, আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন?

জ্বি আম্বার, আমি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি।

আপনার কাছে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে কী খবর রয়েছে?

আম্বার, আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি গাজীপুর চৌরাস্তায়। এখানে গার্মেন্টস নারী শ্রমিক ফেডারেশনের একজন নেত্রী একটু আগেও বক্তৃতা প্রদান করছিলেন। কিন্তু পরিস্থিতি আরো নাজুক হবার আশংকায় তাঁকে কিছুক্ষণ আগে মহিলা পুলিশ দিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলে নেয়া হয়েছে। আম্বার, আমি আপনাকে এতোটুকু জানাতে পারি গ্রেফতারকৃত মহিলা কোনো গার্মেন্টসে কাজ করেন না। তিনি একসময়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন।

আপনাকে ধন্যবাদ সালেহা।

আজকে আমরা আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি ফিরোজ গ্রুপের কর্ণধার জনাব ফিরোজকে।

মিঃ ফিরোজ, আপনি অনেকদিন গার্মেন্টস ব্যবসার সাথে জড়িত। আপনার কি মনে হয় শ্রমিকদের এই আন্দোলন ন্যায্য আন্দোলন?

ধন্যবাদ আম্বার আপনাকে। প্রথমেই আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই—এই আন্দোলনটা সম্পূর্ণ বহিরাগত কোনো শক্তির করা। একটা বিষয় বললেই আপনি এবং

কী দাঁড়াচ্ছে! বস্ত্রশিল্পকে অস্থিতিশীল করার মাধ্যমে দেশীয় অর্থনীতি স্থবির করে দেবার জন্যেই আসলে কোনো অশুভ চক্র মাঠে নেমেছে!

মিঃ ফিরোজ, আমি আসলে আপনার কাছে এই আন্দোলনের যৌক্তিকতা জানতে চাচ্ছিলাম।

বেতন তো সবাই-ই বাড়াতে চায়, আম্বার সাহেব, আপনি কি চান না আপনার বেতন বাড়ুক? তার জন্যে কি রাস্তায় নামতে হবে? যেখান থেকে আপনার ব্রেড এন্ড বাটার আসবে সেই প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিলে কোনো মজুরি কি আপনি আদৌ পাবেন?

মিঃ ফিরোজ, এ কথা তো সত্য যে গত প্রায় বারো বছরে কোনো মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়নি। ন্যূনতম মজুরি অনেক কারখানায় ছয়শ টাকাও আছে। আপনারা ঘণ্টা প্রতি ওভারটাইম দিচ্ছেন মাত্র নয় টাকা।

আপনার সব কথা আম্বার সাহেব সত্যি নয়। এখানে স্কিলড এন্ড নন-স্কিলড ম্যানপাওয়ারের একটা ব্যাপার আছে। আপনাদের মিডিয়ার স্বভাব হচ্ছে সবকিছু বাড়িয়ে বলা।

আমরা কথা বলছিলাম ফিরোজ গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব ফিরোজের সাথে। মিঃ ফিরোজ, স্টুডিওতে আসার জন্যে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

পাঁচ

মাথায় চারটা স্টিচ পড়েছে মিনহাজের। সারা শরীরে ব্যথা। এমন মার ও বোধ হয় জন্মাবধি খায়নি। মনে ক্ষোভের জমায়েত হচ্ছে। এর মাঝেই ও মোল্লার উঠানে যায় খবর দেখতে। মিনহাজের ইচ্ছে করে ফিরোজের প্রত্যেকটা কথার উত্তর দিতে, কে শুনবে ওর কথা? পাশে বসা জুম্মনকে বলে, 'দেখছস শালার মিথ্যা কথা? কেমনে সব এড়িয়ে গেলো! বেচারা খবর পড়া লোকটারে কইলো মাঝখান দিয়া 'আপনারা সবকিছু বাড়িয়ে বলেন।'

মাইয়াগোরে মিছিলে আইলে বেইজ্জত করে। সিস্টার এন্ড ব্রাদার্স সোয়েটার এর রুম্পার জামা যে পুলিশে ছিঁড়লো এটা ফিরোজ মিয়া দেখে নাই! এর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে নাই। বলে নাই মাইয়াগো এমন বেইজ্জত করা দেশের পুলিশ দিয়া উচিত না।

মিনহাজ ভাই, তুমি কারে উচিত-অনুচিত দেখাও! হ্যাগো কী হয় রুম্পায়! তাগো বউ-মাইয়া সহিসালামত থাকলেই হইলো। কোনহানের কোন বান্দীর ঝি রুম্পা তার কাপড় ছিঁড়ছে, তার লাগি ফিরোজ মিয়া তার 'মাকামে মাহমুদ'-এ পৌঁছানো মুখ দিয়া দুঃখু প্রকাশ করবো! তোমার আশাও। বাদ দাও ভাই। ঘরে গিয়া ঘুমাও। টিভি দেইখা

গেলো শুক্রবারে মসজিদে গিয়া ইমামের মুখে শুনছি। হালায় জামায়াতী ব্যাটা ওর পিছনে আর নামায পড়ুম না। এইটা বেহেশতের আরেক নাম। 'মাকামে মাহমুদ'।

মসজিদে কী হইছে?

আর কইয়ো না। গেলেই খালি প্যাঁচাল, দ্বীনের পথে আসেন। তিনদিন ধরছে জামায়াতী ইসলামী দলের কী জানি কী কয়, সাথী না ডিম হইবার জন্য। আমার পেটে নাই খাবার, বলে দ্বীনের পথে আসেন। আরে ব্যাটা, আমার ভালো লাগলে নামায পড়ুম, না লাগলে পড়ুম না। তুই আমার পিছে লাইগা থাকনের কে? আল্লাহ তোরে এজেন্সি দিছে আমারে তোগো দলে নেওনের লাইগা!

জুম্মন, যাবি না, যাবি না। বেশি কথা ওগোরে কইস না। এরাই অহন দেশের মা-বাপ, মনে রাখিস।

মিনহাজ ভাই, আরো শোনো, মজার তো কোনো শেষ নাই। খালি মাইয়াগো এইটা করা ঠিক না, ঐটা করা ঠিক না, এই নিয়া ওয়াজ। হেদিন কয় দেশ শাসন মাইয়াগো করার কোনো এখতিয়ার নাই। ঐদিকে বেটির আঁচলে পাঞ্জাবি আর দাঁড়ির খুট বাইন্ধা জোট গড়ছে। এই ইমাইম্মা শালায় বিয়া করছে তিনটা। আবার শুনলাম মাদ্রাসার কোন ছাত্রীরে আকথা কুকথা কইছে, হেইটা নিয়া শালিস হইতে হইতে হয় নাই। ওর ঐ সাথী না শিবির ভাইয়েরা কোনোমতে মাইয়ার বাপমারে ডর দেখাইয়া বন্ধ করছে।

জুম্মন, তুই কিন্তু ম্যালা প্যাঁচাল পাড়তাছস। কালকে ঠিকমতো যেন যাইবার পারি সেই যোগাড় কর্।

মিনহাজ রুমে এসে মাথা টিপে শুয়ে পড়ে।

ছয়

'এজাজ ভাই, আপনাকে কোথায় পাঠাচ্ছে আজ?'

'সাভার। আপনাকে?'

'আশুলিয়া।'

'মিরাজ, দেখেন আগামীকালের পত্রিকায় আমি, না হয় আপনি লিড নিউজ করবো।'

'এজাজ ভাই, আপনার কি মনে হয় এটা জেনুইন আন্দোলন?'

'এজাজ, এই খবর কভার করতে গিয়ে আমি যে কতো ইন্টারেস্টিং সব মতামত পেয়েছি, তুমি শুনলে অবাক হবে। আমার বিশ্বাস তুমিও পেয়েছো, আমারটা আগে শুনতে চাচ্ছো এই আর কী! '

'আপনাকে এজন্যই বস মানি। বলেন না বস, আপনার কিছু জানা জিনিস, আমিও আপনাকে আমারগুলো শেয়ার করবো।'

'গতকাল আমি গিয়েছি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এক সাবেক উপদেষ্টার বাসায়, কেন পাঠানো হয়েছিল তুমি জানো, উনি একাধারে শিল্পপতিও। তো তাঁর কারখানা ভালো ক্ষতির মুখে পড়েছে। উনি আমাকে কারখানার নাম, মালিকের নামসহ বলে যে পরিসংখ্যান দিলেন তাতে আমার দশ বছরের সাংবাদিকতা যে আসলে কিছুই শেখায়নি তা মনে হলো। উনি নাম দিয়ে বললেন, যেসব মালিকরা বিরোধীদল ঘেঁষা, আসছে নির্বাচনে যারা পার্টির ফান্ডে বড় অংকের ডোনেশন দেবার কথা, বেছে বেছে তাদের ফ্যাক্টরিতে হামলা চালানো হয়েছে। এসময় যদি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় এসব মালিক তাহলে নির্বাচনের প্রাক্কালে তারা ডোনেট করতে পারবে না পার্টি ফান্ডে আশানুরূপ। ফলে বিরোধীদল নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে তারল্যের সংকটে ভুগবে।'

'বলেন কী এজাজ ভাই!'

'ইয়েস ব্রাদার মিরাজ, এটা শুনতে ক্রুয়েল হলেও তার দেয়া তথ্য অনুযায়ী আমি তালিকা মিলিয়ে দেখলাম, কথা সর্বাংশে না হলেও আংশিকভাবে সত্যি। এবার তোমারটা বলো মিরাজ।'

'শোনেন বস, আমাকে আমার সোর্স বললো, এ সপ্তাহের মধ্যেই আন্দোলন ঠাণ্ডা করে দেয়া হবে। অলরেডি দু ভাগ করে ফেলা হয়েছে। খায়রুল আর বকর গ্রুপ। খায়রুল একটু ফর্মে আছে। ওকে পর্যাপ্ত টাকা দিয়ে একটা আপস রফা হয়ে যাবে। আন্দোলনের মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যাবে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে।'

'সেটাই, সব যুদ্ধেই মীরজাফররা থাকে। জগৎশেঠরা টাকার জন্যে দেশ বিক্রি করে দিয়েছে, আর এ তো সামান্য গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতনভাতার আন্দোলন!'

'টাকা খেয়ে পল্টি খাবে দেখবা সহসাই। মাঝখান দিয়ে কিছু হতভাগা ছাঁটাই হবে। কিছু মারাও যাবে। চলো মিরাজ, বের হয়ে পড়ি।'

'চলেন এজাজ ভাই।'

সাত

সুমি জামিনে ছাড়া পেয়েছে। জেলে গেলে অবশ্য যে কোনো নেতার কদর বাড়ে। এটা এক ধরনের স্টান্টবাজি, সুমির খারাপ লাগেনি। এখন মালিকরা বুঝবে ও যে এই আন্দোলনে একটা বিরাট ফ্যাক্টর। অশিক্ষিত সব মেয়ে গার্মেন্টসে চাকরি করে। ওদের একটা দাবি সংবলিত স্মারকলিপি লিখে দেবে এমনও তো কেউ নেই। সেসব ক্ষেত্রে সুমিই তো ওদের ভরসা। ভার্সিটিতে থাকতে ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত থাকা এক্ষেত্রে সুমিকে দিয়েছে বাড়তি সুবিধা। আগে মোটামুটি একচ্ছত্র রাজত্ব করেছে সুমি। বর্তমানে আরো কিছু এনজিও এবং নারী সংগঠন আসাতে সুমির কর্তৃত্ব কিছুটা খর্ব হয়েছে। বিশেষ করে রেহনুমা যে নিজে একজন সাধারণ শ্রমিক থেকে কাটিং মাস্টারে উন্নীত হয়েছে তার দাপট বেশ বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে সুমিকে। সুমি শুনতে পাচ্ছে মালিকপক্ষের সাথে বেতন নিয়ে নেগোসিয়েশনে রেহনুমাকেই নারী শ্রমিকরা তাদের

এখন কী করা যায়? ভাবতে থাকে সুমি। কার কাছে গেলে সুমি ভালো একটা দাঁও মারতে পারবে তা নিয়ে ডুয়েল কোর প্রসেসরের স্পিডে সুমির ভাবনা চলতে থাকে। পাওয়া গেছে, জগলুল সাহেবকে ভজাতে হবে।

সুমি জগলুল সাহেবের সাথে দেখা করার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। একটা ঘণ্টাও দেরি হওয়া মানে মোটা অংকের একটা টাকা হারানো।

'কে বলছেন?'

'আমি গার্মেন্টস নারী শ্রমিক ফেডারেশনের বিশেষ প্রতিনিধি সুমাইয়া সুমি বলছি। আপনি জগলুল সাহেবকে আমার নাম বলেন। আই থিংক হি উইল বি ইন্টারেস্টেড টু মিট মি।'

'স্যার আপনাকে আজ বিকেল পাঁচটায় বনানীর অফিসে দেখা করতে বলেছেন।'

'জ্বি সুমি, বলুন আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি? আপনারা তো আবার আমাদের আসল নিয়ন্ত্রণকারী। আপনাদের ঠিকমতো খেদমত করতে না পারলে আগামীকাল আবার আমার ফ্যাক্টরিতে কী ক্যাওস লাগান কে জানে!'

'কী যে বলেন জগলুল ভাই!'

'আমাকে একটা সম্মানজনক খরচ দেন, দেখেন আমি আপনার ফ্যাক্টরি ঠিকমতো চলার ব্যবস্থা করে দিতে পারি কী না! আমার উপর আপনার আস্থা আছে তো জগলুল ভাই? গতবার আপনার ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগে পাঁচজন মেয়ে মারা গেলে পুরো ব্যাপারটা আমি কিভাবে ডিল করেছি সেটা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি!'

'কতোতে ডিল হবে বলেন?'

'আপাতত পঞ্চাশ দিলে আমি আপনার কাজটা করে দেবো জগলুল ভাই। আমাকে কিন্তু মেয়েরা এখনো মানে। রেহনুমা টাফ নাট। ওকে ভাঙ্গানো আপনাদের জন্যে খুব সহজ হবে ভাববেন না যেন!'

'সুমি, এমনিতেই গত কয়দিনে বেশ লোকসান হয়ে গেছে। আমি আপনাকে বড়জোর বিশ হাজার দিতে পারি।'

'জগলুল ভাই, আপনি যদি এতো হাত চিপা করেন তাহলে আমি কোথায় যাবো বলেন তো!'

'আচ্ছা ত্রিশ।'

'ঠিক আছে। তবে এখনই ক্যাশ দিতে হবে।'

'ওকে, ডান।'

'সুমি টাকাটা নিয়ে বেরিয়ে যায়।'

নারী শ্রমিকদের একাংশকে বুঝিয়ে ফেলে ওদের এই আন্দোলনের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। বরঞ্চ এমন চলতে থাকলে কারখানা গুটিয়ে নেবে অনেকেই।

সুমি ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি খাটিয়ে সফল হয়।

সুমিরা এভাবেই কোনো ঘটনার ভুক্তভুগি না হয়েও মোটা চাঁদার বিনিময়ে ত্রাণকর্তা সাজে শোষিতদের কাছে। মেয়েরা আবার ফিরে যায় তাদের নিজ নিজ মেশিনের

সামনে। সুমি কোনো জব করে না। ছাত্রজীবন শেষ হবার পর থেকে এভাবেই ও চলছে। ট্রেড ইউনিয়ন না থাকাতে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে সুমিদের পোয়াবারো।

আট

'চোখ বন্ধ' চ্যানেলের সন্ধ্যার খবরে আপনাদের আমন্ত্রণ। এখন শুনবেন 'এমপি ব্যাংক' শিরোনাম।

গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকরা শেষ পর্যন্ত একটি সমন্বিত সিদ্ধান্তে উপনীত মজুরি নির্ধারণে।

আন্দোলন আপাতত স্থগিত।

এবারে বিস্তারিত।

আজকে এক বৈঠকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারিত। গত কয়দিনের চলমান অস্থিরতা অবশেষে বন্ধ হলো। শ্রমিকদের পক্ষে আলোচনায় অংশ নেন খায়রুল এবং রেহনুমা।

আমরা এখন শুনবো শ্রমিক প্রতিনিধি রেহনুমার প্রতিক্রিয়া।

এটা একটা ভালো উদ্যোগ। মালিকরা অন্তত আমাদের অভিযোগ শোনার জন্যে আমাদের ডেকেছেন।

আপনি কি এই মজুরি নির্ধারণকে স্বাগত জানাচ্ছেন?

আমি মনে করি উদ্যোগটা ইতিবাচক।

আমরা শুনেছি আপনার অনমনীয়তার জন্যেই যতোটুকুই মজুরি বেড়েছে, বেড়েছে। অন্য অনেক নেতানেত্রীই টাকার বিনিময়ে এই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। কথাগুলো কি সত্যি?

এমন আমিও শুনেছি। সত্যমিথ্যা জানি না। প্রমাণ ছাড়া কি কথা বলা উচিত, ভাই আপনি নিজেই বলেন?

মালিকরা আশা করছেন এর ফলে এই সংকট থেকে উত্তরণ ঘটবে।

এবার আন্তর্জাতিক...

মিনহাজ চোখ ফেরায় টিভি থেকে।

খায়রুল আর সুমি যদি টাকা খেয়ে বসে না থাকতো মিনহাজরা আরো কিছুদিন এই আন্দোলন চালাতে পারতো। হায়রে আন্দোলন! মিনহাজ সেলাইয়ে হাত বোলায়। কেন যে সব এমন আধা খ্যাচরা করে ছেড়ে দেয় কে জানে!

নয়

'সামাদ ভাই, ফিরোজ সাহেব, আরো যারা উপস্থিত আছেন তাঁদের আমি আজকে এক বিশেষ কারণে ডেকেছি। আপনারা জানেন আমি কোন অবস্থা থেকে বর্তমানের পজিশনে এসেছি। আমি আমার মেহনতের এইসব প্রতিষ্ঠান কোনো কারণেই নষ্ট হতে দেবো না। আপনারা কি আপনাদেরগুলো হতে দেবেন?'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'আমি এই ব্যবসায় আছি বারো বছর। অভিজ্ঞতা থেকে জানি এসব শ্রমিকদেরকে ছোট করে দেখার কোনো কারণ নেই। সৎ, যোগ্য নেতৃত্ব পেলে এবার এরা আমাদের চামড়া তুলে নিতে পারতো। অনেকদিনের চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ এরা এবার ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতে ওরা আবার এমন করবে না তার কোনো গ্যারান্টি কিন্তু খায়রুল কিংবা সুমি কেউই দিতে পারবে না। সাময়িকভাবে ধামাচাপা দেয়া গেছে, এর বেশি কিছু না।'

'জগলুল ভাই, আপনি আমাদের কী করতে বলেন?'

'সামাদ সাহেব, বড় বড় কিছু ফ্যাক্টরি যাদের আইএসও সনদ আছে, কমপ্লায়েন্স ছাড়া যেসব বায়াররা অর্ডার দেয় না, সেগুলো বাদ দিলে কিন্তু অধিকাংশ কারখানাতেই আসলে মানবেতর জীবনযাপন করে শ্রমিকরা, এটা আমি স্বীকার করি। আমি আপনাদেরকে একটাই পরামর্শ দেবো, যার যার কারখানার পালের গোদা খুঁজে বের করুন। এগুলোকে সাইজ করলেই বাকিরা আপ্‌সে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, ভয় পাবে। আজকের সভা এখানেই শেষ করছি। আমার পরামর্শ ভেবে দেখুন, নিজের মতো করে তা প্রয়োগ করুন।'

দশ

মিনহাজের সকাল থেকেই বাম চোখ লাফাচ্ছে। কাজে এসেছে, কিন্তু কোনোভাবেই মন বসাতে পারছে না। ওর কেন জানি মনে হচ্ছে ওকে কেউ যেন আড়াল থেকে লক্ষ্য করছে। খুবই অস্বস্তির ব্যাপার।

আজকে আর ওভারটাইম করবে না। মিনহাজ পাঁচটা বাজতেই বেরিয়ে পড়ে কারখানা থেকে।

বাম চোখ ঠিকই জানান দিয়েছিল। রাতে মোল্লার বাসা থেকে টিভি দেখে ফেরার পথে চার-পাঁচজন মিনহাজকে ঘিরে ফেলে। চলে হকিস্টিকের এলোপাথাড়ি বাড়ি।

মিনহাজ পঙ্গুতে ভর্তি হয় সে রাতেই। বাম পা, ডান হাত ভাঙ্গা। তিনটা তাজা দাঁত মৃত। জানে যে বেঁচেছে এই যথেষ্ট।

মিনহাজ যে কারখানায় চাকরি করতো সেখানকার মালিক জগলুল সাহেব মিনহাজকে এসে দেখে যান। ওর চিকিৎসার সব ব্যয়ভার বহন করার আশ্বাস দেন।

জগলুল সাহেবের ফ্যাক্টরি আবার যতে যায় নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদনের রেইসে